বাংলাদেশঃ মারাত্মক অপপ্রচারণা, ষড়যন্ত্র ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের শিকার

এম.টি হোসেন

লেখক পরিচিতি

লেখক এম, টি, হোসেন প্রযুক্তি, অর্থনীতি, শিক্ষা বিজ্ঞান, নীতি- পরিকল্পনা বিষয়াদী নিয়ে ঢাকা ও লন্ডনের ওকলাহোমা (ষ্টীলওয়াটার) বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক পড়াশুনার পর ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৮২ সন পর্যন্ত ২৫ বছরে তদীনন্তন পূর্ব পাকিস্তান, করাচী এবং বাংলাদেশের বহু কারিগরী কলেজে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে ১৭ বছর ধরে তিনি টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা, ইসলামিক ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি (ভূতপূর্ব আইসিটিভিটিআর), গাজীপুর এবং সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর দারুল আহসান বিশ্ববিদ্যালয়- এ অর্থনীতি, কারিক্যুলাম, কোর্স প্ল্যানিং, কমপারেটিভ এডুকেশান এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামিক দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে মূলত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রদান করেছেন।

লেখক তার কলেজ জীবনের শুরুতে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশে প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষারই বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িকীতে অব্যাহতভাবে লিখে যান। তিনি বিভিন্ন ধরণের জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথেও নিজকে সম্পৃক্ত রাখেন।

প্রযুক্তি বিষয়ক কিছু প্রকাশনার (অটোমোবাইল এন্ড রিফ্রেজারেশন) সম্পাদনা ছাড়াও তার লেখা বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে ইন্ডিয়া'জ ফারাক্কা ব্যারেজঃ কোল্ড ব্ল্যাডেড মার্ডার অব বাংলাদেশ (১৯৯৬), বাংলাদেশ: জঘন্য অপপ্রচারণা, ষড়যন্ত্র ও ভারতীয় আগ্রাসনের শিকার (১৯৯৬/২০০৮) এবং সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, প্যাট্রিয়ট- ট্রেইটর কোশ্চেনঃ বাংলাদেশ সিনড্রম (২০০৬), দুর্জন রাজনীতিকদের কিছু চালচিত্র (২০০৬), দুর্বৃত্তপনা রাজনীতিবীদদের কিছু হাল হকিকত (২০০৬), মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ইসলামী শিক্ষা দর্শনের সন্ধানে (২০০৭) উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি সিক্সটি টু লেটারস অব প্রফেসর ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (২০০৪) শীর্ষক একটি বই গ্রন্থনা করেছেন যে চিঠিগুলো দশ বছর ধরে লেখককে উদ্দেশ্য করে লেখা ছিল।

আল হিলাল পাবলিশার্স লিঃ
ব্রুমলি, কেন্ট
যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
দ্বিতীয় সংস্করণঃ ২০০৮ইং

"জীবদ্দশায় যিনি তার জীবনের অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ইতিহাস লিখে থাকেন, তাকে তার প্রতিটি ছত্রের জন্য সমালোচনাসহ নানাবিধভাবে আক্রান্ত হতে হয় এবং যা তিনি লিখেননি তার জন্যও; অথচ নুন্যতম কোন ব্যতয় বা অপূর্ণতার জন্যে সত্য ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী কাউকেও অনুৎসাহিত করা সমীচিন নয়; সমীচিন নয় তার সমালোচনা করা, যিনি জীবনে ত্যাগ ভিন্ন কোন কিছুই চাননি, কোন কিছুকে ভয় করেননি এবং তার সকল আকাঙ্খাই ছিল প্রকৃত তথ্য ও সত্যকে প্রকাশ করা।"

-ভল্টেয়ার

মুখবন্ধ

গত তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে মারাত্মক প্রচারণায় মুষড়ে পড়া আমার মত কিছুটা বোধ- বুদ্ধি- বিবেকধারী মানুষের অনেকটা প্রতিবাদ স্বরূপই বাংলাদেশঃ মারাত্মক অপপ্রচারণা, ষড়যন্ত্র ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের শিকার শীর্ষক এই বইটি লিখিত। অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও সত্যি যে, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পিছনে নিহিত প্রকৃত কারণ সমূহ প্রকাশ করার সাহস দেখানোর মত একজন ব্যক্তিও আজ অবধি লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে সাধারণ মানুষকে ১৯৭২ সাল থেকে শুরু হওয়া গোয়েবলসীয় কায়দার মিথ্যাচারের সামনে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। আবার অনেককেই অনেকটা অবচেতনভাবে মিথ্যাকেই প্রকৃত সত্য বলে বিশ্বাস করে যেতে হচ্ছে।

এটা অত্যন্ত দুভার্গ্যজনক যে মিথ্যা, আংশিক সত্যি এবং অর্ধ- সত্যকে কেবল কায়েমী স্বার্থবাজরাই সত্যি বলে গণ্য করছেনা; অত্যন্ত নিরীহ মানুষও যুক্তি- তর্কের কোন তোয়াক্কা না করে এটাকে সত্যি বলে গণ্য করছে। আজকের স্কুল পড়ুয়া ছাত্র যাদের স্কন্ধে ভবিষ্যতে এই জাতির দায়- দায়িত্ব বর্তাবে, তাদের স্কুল পাঠক্রমে সে বিষাক্ত প্রচারণাসমূহ সন্নিবেশিত করা আছে; যার ফলশ্রুতিতে শত- সহস্র বছরের পুরনো একটি মুসলিম জাতি ও সমাজের চিহ্ন ভবিষ্যতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

সত্যকে উচ্ছ্বকিত রাখতে আমি ওয়াদাবদ্ধ বিধায় সত্যকে সত্যি এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে কোনরূপ দ্বিধা- সংকটে আমি নিপতিত হইনি। বহু তিক্ত সত্যকে আমি যথাযথ প্রামাণ্য উপাত্ত সহকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি প্রামাণ্য ও তথ্যপূর্ণ এই সব নির্জলা সত্য মিথ্যার বেসাতিতে ভরপুর তথাকথিত ইতিহাসকে পদদলিত করবে। ফলশ্রুতিতে হয়তো ঐসব মিথ্যাচারের হোতা, রক্ষক ও তাদের সেবাদাসরা আমার প্রতি কেবল রুষ্টই নয়, আমার বিরুদ্ধে তারা হিংসাত্মক পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে। সম্ভাব্য সেই সব হিংসাত্মক মহলের প্রতি আমার অতি বিনয়ী আহবান থাকবে যে দয়া করে আমার উপস্থাপিত তথ্য ও পর্যবেক্ষণকে ভিত্তিহীন বা অমূলক প্রমাণ করার জন্যে আপনাদের যদি কোন তথ্য থেকে থাকে তা উপস্থাপন করুণ এবং তার ভিত্তিতে আমার বিরুদ্ধে অকাট্য অভিযোগ পেশ করার কাজে মনোনিবেশ করে দেখুন সফল হতে পারেন কিনা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটা আমি অত্যন্ত আস্থা ও সততার সাথে বলতে পারি যে আমি কাকেও কোনভাবে আঘাত করা কিংবা কারো চরিত্রহনন করাতে বিশ্বাসী নয়। আমি চাই আমাদের সন্তানরা তথা জাতির ভবিষ্যত যাতে মিথ্যাচারের বেড়াজালে আবদ্ধ না থাকে এবং পাশাপাশি তারা যেন যে কোন ধরণের হীনমন্যতার উর্ধে উঠে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এক স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে সর্বধরণের প্রভাব, আগ্রাসন ও আগ্রাসী মতবাদকে মোকাবেলা করার সাহস রাখে। আমি বাংলাদেশের মাটিরই সন্তান। আমার পিতৃ পুরুষরা ত্যাগী মুসলমান হিসেবে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে এই মাটিতে বসবাস করে আসছে। আমি চাই আমাদের ভবিষ্যত বংশধররা যেন সর্ব অবস্থাতেই প্রকৃত মুসলমান হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করে এবং এমন কোন জীবনাচারের গোলামে পরিণত না হয় যে জীবনাচার কোন বিবেচনাতেই মুসলমানদের জীবনাচারের চাইতে উন্নত নয়।

অবশ্যই আমার এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বস্তুত এই বই ১৯৮৯ সালে লন্ডনে আমার লেখা ডিলেমা ফর বাংলাদেশ এণ্ড পাকিস্তান ফেসিং ইন্ডিয়ান হেজিমনি শীর্ষক একটি বইয়ের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। যদিও দুভার্গ্যক্রমে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার জন্যে সে বইটি বই আকারে কখনো মুদ্রণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। আমার কিছু বন্ধ- বান্ধবের অব্যাহত এবং জোর তাগিদ ছাড়া হয়তো এই বইটিও মুদ্রিত আকারে আলোর মুখ দেখতো না।

লন্ডনে বসবাসরত শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডঃ এ,এম, ওহিদুজ্জামান- এর নিকট আমি গভীরভাবে ঋণী, যিনি একজন ছোট ভাইয়ের স্নেহ আমাকে প্রদান করে এই বই সম্পন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। উনার দৃষ্টিশক্তিতে যথেষ্ট সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি এই বইয়ের বেশ কিছু অংশ দেখে দিয়েছেন। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ এম.এ. আজিজের অবদানকে; যিনিও দৃষ্টিশক্তির সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই বইয়ের কিছু কিছু অংশ দেখে দিয়েছেন এবং পরিমার্জন, বিয়োজন এবং সংযোজনে অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেছেন। আমি আর একজন ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ না করে পারছিনা যিনি হচ্ছেন প্রাক্তন সিএসপি, স্বনামধন্য লেখক এবং সর্বোপরী একজন সাচ্চা মুসলমান জনাব পি.এ. নাজীর। তিনি এই বইয়ের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতা অর্জনে যথেষ্ট মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। সর্বশেষ আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবো লন্ডন- এর আল হিলাল পাবলিশারস- কে যারা এই বইটি মুদ্রণে এগিয়ে এসেছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বাংলাদেশঃ মারাত্মক অপপ্রচারণা, ষড়যন্ত্র ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের শিকার বইটি ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত হবার পর ইতিমধ্যে ১২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পথ চলার ইতিহাসে অনেক পরিক্রমন ও পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বৈদেশিক নীতি সহ প্রায় সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বোপরী দুই দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনাচারে। কিন্তু তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি এই দু' অঞ্চলের মধ্যকার তথাকথিত বৈষম্যের - যার ভিত্তিতে পূর্বাঞ্চলের সাধারণ মানুষের নিকট তাদেরকে শোষণ- বঞ্চনার গল্প রটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অথচ আমাদের পূর্ব পুরুষেরা বৃটিশ শাসিত হিন্দু- প্রধান ভারতে মুসলমানদের এই আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠায় অবর্ণনীয় ত্যাগ- তীতিক্ষা দেখিয়েছিলেন। বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক রাজনীতিতে কিছু কিছু মোড় পরিবর্তন ঘটলেও এটা আমার বিশ্বাস যে ১২ বছর পূর্বে আমি আমার প্রিয় দেশ বাংলাদেশ সম্পর্কে উক্ত বইয়ে যে উপসংহার টেনেছিলাম, তা আজও অপরিবর্তনীয়। বুদ্ধিভিত্তিক চর্চার মধ্য দিয়ে বেশ কিছু তথ্য দীর্ঘকাল চাপা থাকার পর বেরিয়ে এসেছে যেগুলো আমি দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভূক্ত করেছি। এর কিছু কিছু আমি প্রথম সংস্করণের ফুটনোটে উল্লেখ করেছিলাম। তবে এবার সে সবের মোটামোটি সংক্ষিপ্ত সার সন্নিবেশন করায় বইয়ের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি আশা করি সহৃদয় পাঠক সমাজে দ্বিতীয় সংস্করণ আরো অনেক বেশী সমাদৃত হবে।

এম, টি, হোসেন
১০ জানুয়ারি, ২০০৮ইং

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রারম্ভিক কথা		১
অধ্যায় এক	তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য সম্পর্কিত অলীক কাহিনী ও স্বায়ত্বশাসনের দাবী প্রসঙ্গ	৬
অধ্যায় দুই	ভারতীয় ষড়যন্ত্রের সহায়তায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অর্জন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশঃ পরবর্তীতে কী ?	২৭
অধ্যায় তিন	১৯৭১ সালের পর থেকে একাত্তরের হত্যাকান্ডের একপেশে কল্পকাহিনী ও মিথ্যাচার	৪৭
অধ্যায় চার	বাংলাদেশে মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও স্বার্থ সংঘাতের গতি- প্রকৃতি	৬৩
অধ্যায় পাঁচ	একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় আধিপত্যঃ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের উভয় সংকট	৯৮
পরিশিষ্ঠ এক	বাংলাদেশ- ভারত ২৫- সালা চুক্তি	১১৯
পরিশিষ্ঠ দুই	১৭৫৭ সালের মীরজাফর ও বৃটিশদের চুক্তি	১২২
পরিশিষ্ঠ তিন	তাজউদ্দীনের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী সরকার কর্তৃক ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত ৭ দফা গোপন চুক্তি	১২৪

প্রারম্ভিক কথা

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার যে প্রক্রিয়া ১৯৭১ সনে পূর্ণতা লাভ করে তার স্থপতি- কারিগর হচ্ছে ভারত। নতুন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম লাভের পরপরই ভারতীয় সংবাদপত্র এই মর্মে এক বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণা শুরু করে যে পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের 'কলোনী' এবং উক্ত প্রচারণায় এটাও বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানকে কেবল নিষ্ঠুর রাজনৈতিক শোষণই নয়, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিকভাবেও শোষণ করা হচ্ছে। ঐ বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণাকে আরো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলার জন্যে সেই সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরূপী ভারতীয় চর অতি উৎসাহের সাথে উঠে পড়ে লাগে এবং সে কাজে তারা বছরের পর বছর থেকে লেগে থাকে। আর তাদের সেই অতি উৎসাহী ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তৎপরতায় সামিল হয় তখনকার একশ্রেণীর সংবাদপত্র। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ তাদের প্রচারণায় অতিদ্রুতই কাবু হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ এটা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে যে, তাদের সকল ধরণের দুর্ভোগ ও দুঃর্ভাগ্যের জন্য দায়ী হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা। ফলে ষাট- এর দশকের শেষ দিকে উক্ত প্রচারণার শিকার পূর্ব পাকিস্তানীরা এটা বদ্ধমূলকভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের যদি পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে তাড়িয়ে দেয়া যায়, তা হলে পূর্ব পাকিস্তান সোনার বাংলায় পরিণত হয়ে যাবে- যেখানে দুধ ও মধুর নহর বইবে আর তারা তা অবারিতভাবে উপভোগ করবে।

উপরিউল্লেখিত বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণার জন্ম দেয়া হতো ভারতের মাটিতে, আর তা পূর্ব পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবিদের নিকট সরবরাহ করা হতো। সেই প্রচারণাকে মোকাবেলার ক্ষেত্রে পাকিস্তানী সংবাদ মাধ্যম অত্যন্ত দূর্বলতার পরিচয় দেয় কিংবা তারা বোকার মতো এক ধরণের আত্মপ্রসাদ- এ তন্ময় হয়ে থাকে। ফলে ১৯৭১ সালে পতন ঘটে পূর্ব পাকিস্তানের; আর সে ধ্বংসাবশেষ থেকে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।

বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তার স্বাধীনতার ৩৭ বছর পার করেছে। প্রায় ১৪ কোটি মানুষের এই দেশে অতি স্বল্প সংখ্যক মানুষ হয়তো তাদের ভাগ্য গড়ে স্বচ্ছলতা অর্জন করেছে। কিন্তু তাদের অনেকের অবস্থা পূর্বেকার চাইতেও খারাপ হয়েছে। অন্ততঃ ৪ কোটি অবস্থান দ্রারিদ্র সীমার বহু নিচে। শ্লোগানের উচ্ছ্বাস আর উচ্ছাশা এখনও অলীক ও মিথ্যাই রয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর থেকে সাহায্য ও ঋণ হিসেবে বাইরে থেকে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশের অর্থনীতিতে

যোগান দেয়ার পরও কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবন নিঃস্বতর পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভকারী পৃথিবীর অপরাপর কোন দেশের ক্ষেত্রে এমন নজীর নেই। এ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের যে জিগির তুলে ষাট এর দশক থেকে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপণ ও বিচ্ছিন্নতার দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেসব জিগির ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যাচার।

রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ নামেমাত্র একটি রাষ্ট্র। বস্তুতঃ গত ৩৭ বছর ধরে দেশটাকে ভারতের একটি জায়গীর হিসেবে পরিচালনা করে আসছে ভারতের এজেন্ট এবং কুইসলিংরা- যারা দেশটিকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। তাদের একমাত্র বিশ্বাস হচ্ছে দিল্লীতে থাকা তাদের মনিবদের স্বার্থরক্ষা করাই তাদের দায়িত্ব। আমলাদের একাংশ শাসকদের মতই অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ এবং অত্যন্ত হীনভাবে ভারতের গোলামী করতে একপায়ে খাড়া থাকে।

প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয় ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW (Research and Analysis Wing) এর সুপারিশ মোতাবেক। এটা কোন কাল্পনিক বিশ্লেষণ নয়; এটা হচ্ছে অত্যন্ত বাস্তব সত্যি, যা খুব একটা রাখ- ডাক পর্যায়েও নেই।

সাংস্কৃতিকভাবেও ভারত বাংলাদেশের উপর তার আধিপত্য চালিয়ে থাকে। শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে দেবত্ববাদী পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম থেকে উৎসারিত ভারতীয় দর্শনের প্লাবন বইছে। অথচ বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মানুষের হৃদয় একশ্বেরবাদী ধর্মে নিবেদিত। উচ্চশিক্ষার প্রাচীন বিদ্যাপীঠ রাজধানীতে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করছে ভারতীয় অনুচররা।

১৯৭১ উত্তর সময়ের ছাত্র সমাজের অনেকেই ভারতের বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারনায় প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেদের ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির দূহিতায় পরিণত হয়, যে সংস্কৃতিতে কোন সুনিদ্দিষ্ট মূল্যবোধ বিধৃত নেই। এদের মধ্যে অনেকে ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবিদের সাহায্য- সমর্থনে ছাত্রদের নেতৃত্বে সমাসীন হয়। এই অতি দক্ষ ও সচতুর ভারতীয় প্রভাব কেবল সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেই নয়; অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং প্রকারান্তরে দেশের রাজনীতিতেও তার বিস্তৃতি ঘটে। এই ছাত্র নেতারা তাদের পূর্বসূরী ৭০- ৭১ সনে 'চার খলিফা' হিসেবে পরিচিতদের ন্যায় অসৎ ও অন্যায় পথে অগাধ বিত্ত- বৈভবেরও মালিক হয়ে যায়। দল মত নির্বিশেষে রাজনীতিবীদরা এই ছাত্রদের সমর্থনের জন্য সর্বাবস্থাতেই

উন্মুখ হয়ে থাকে। ১৯৯১ সাল ও ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সর্বাত্মকভাবে ছাত্রদের সাহায্য-সমর্থন-অংশগ্রহণের বদৌলতে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করেন বেগম খালেদা জিয়া। আওয়ামী লীগ, জামাতসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলও একইভাবে ছাত্রদের হীন আচরণ ও তাদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেয় তাদের রাজনীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য। কিন্তু নিষ্ঠুর রাজনৈতিক বাস্তবতা ছিল এই সব ছাত্র নেতারা যেহেতু ধর্ম নিরপেক্ষতার দীক্ষা গ্রহণ করে, সেহেতু তারা মুখ্যতই চায় বাংলাদেশে ভারতীয় আগ্রাসন ও তাদের সংস্কৃতির বিকাশ। তারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ৯০ শতাংশের মুসলিম মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক আকাঙ্খার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। বস্তুতঃ ইসলাম ও তাদের সংস্কৃতিকে হেয় ও ধ্বংস করাই হচ্ছে তাদের মূল লক্ষ্য।

১৯৭১ সালে জনগণকে এই মর্মে আশান্বিত করা হয়েছিল যে স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের জীবন ব্যবস্থারই কেবল উন্নতি হবে না; দেশ হিসেবে বিশ্বের জাতিপুঞ্জের মতো বাংলাদেশেরও থাকবে সার্বভৌমত্ব। কিন্তু গত ৩৭ বছরের ইতিহাস মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের জনগণের জীবনের কোন উন্নতি ঘটেনি। ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে তারা রেহাই পায়নি। এমনকি ভারতের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্কের যে চালচিত্র তা থেকে এটা স্পষ্ট যে দেশের সার্বভৌমত্বও বলা যায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং ঘটনা পরম্পরায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশের বাজার হচ্ছে ভারতীয় পণ্যের নিকট বন্দী, সংস্কৃতি হচ্ছে ভারতের বৈদিক সংস্কৃতির বর্ধিত রূপ এবং রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে ভারতের গোলাম-এ। কেউ সরকারে থাকুক কিংবা না থাকুক বাংলাদেশে ভারতের আগ্রাসী প্রয়োজন মেটাতে রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রায় প্রত্যেককে অতি বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হয়। বাংলাদেশের ভূখন্ড দিয়ে ভারতের অবাধ ট্যানজিট সুবিধা প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের ব্যবধান মাত্র। তাদের লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে উদ্দিষ্ট অবস্থা সৃষ্টি করতে দিল্লীর শাসকরা তাদের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর মাধ্যমে ভিতর এবং বাইরে থেকে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে থাকে। ভারতের অশুভ খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে হলে বাংলাদেশের সীমান্তের বাইরে তার বন্ধুর দরকার। এটা করার পথে ভারত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে গিয়ে অনেক জাতি, রাষ্ট্রই ভারতের আগ্রাসী আচরণে বিভিন্নভাবে শরমিন্দা ও বিবৃত হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের সাথে অতীতের বহু নিষ্পন্ন ইস্যু উঠিয়ে প্রায়শই ভারতপন্থী মহল বিষাক্ত প্রচারণার সৃষ্টি করে; যার লক্ষ্য হচ্ছে কোনভাবেই যেন

পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে না পারে। এছাড়াও ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো অব্যাহতভাবে সেই পুরনো প্রচারণা চালিয়ে থাকে যে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ছিল একটা মস্তবড় ভুল; যা থেকে বাংলাদেশ-এর শিক্ষা গ্রহণ পূর্বক বাংলাদেশ যদি ভারতের একটি প্রদেশ-এ রূপান্তরিত হয়, তাহলে দেশটির সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চাকমা ইস্যুতে ভারতের উস্কানী ও প্রত্যক্ষ মদদ, অভিন্ন নদীগুলোর পানির হিস্যা নির্ধারণে ভারতের অসম্মতি, বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ ভূখন্ড নিয়ে পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের উদ্ভাবিত স্বাধীন বঙ্গভূমির তথাকথিত আন্দোলনে ভারতের প্রত্যক্ষ মদদ ও উস্কানী হচ্ছে বাংলাদেশের ঐক্য, সংহতি ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংসকারী ভারতীয় অপতৎপরতার লীলাখেলা। ভারতের নগ্ন আগ্রাসনে বাংলাদেশের অসহায়ত্ব দেশ-বিদেশের সকল মহলের জানা। অনেকেই আজ নিশ্চিত যে ১৯৭১ সনে বন্ধু হিসেবে আবির্ভূত ভারত আসলে পরেছিল বন্ধুতের ছদ্মাবরণ। সেই বন্ধুত্বের ভেক ধরার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের বিবেচনায় তাদের এক নম্বরের শত্রু পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য তাদের নোংরা চেহারাটা লুকানো। ১৯৭১ সালে তাদের সেই লক্ষ্য অর্জনের পর তারা তার চূড়ান্ত যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ বাংলাদেশকে ভারতের সাথে একীভূত করার লক্ষ্য সাধনে নিজদেরকে নিয়োজিত করে। এ কারণেই একদিনের জন্যও ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের নানাবিধ হীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা বন্ধ রাখেনি। তাদের এই অব্যাহত হীন প্রচারণায় বরাবরই পাকিস্তান কর্তৃক তার পূর্বাঞ্চলকে শোষণের সেই পুরনো কেচ্ছা ফাঁদিয়ে থাকে। দুঃখজনক হলেও সত্যি বাংলাদেশের কেউ কেউ এই সব প্রচারণায় ভারতের কোন দুরভিসন্ধিপূর্ণ উদ্দেশ্য নেই বলে মনে করে।

এই বই এর মাধ্যমে একটি বিনয়ী ও তথ্য নির্ভর প্রয়াস থাকবে-কেমনিতর অবাস্তব অলীক কাহিনী আর মিথ্যাচার দ্বারা বাংলাদেশ সৃষ্টির ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং চূড়ান্তভাবে কেমনতর পরিণতির দিকে ভারত বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে চায় সে সম্পর্কে জনসাধারণের চক্ষু উম্মীলন করা। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তথাকথিত বৈষম্য নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা ও সে সবের উৎস মূল প্রামাণ্য নথিপত্র সমেত পরিস্ফুট করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ৩০ লক্ষ শহীদ হবার তথাকথিত পরিসংখ্যানের নিগলিতার্থ বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও স্বার্থের সংঘাত এবং তা কিভাবে ভারতীয় পৃষ্টপোষকতায় ১৯৭১ সালের সশস্ত্র সংঘর্ষে রূপ নিল;

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন ও তথ্যপঞ্জীর আলোকে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বশেষ উপসংহার অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে উপমহাদেশে হিন্দু পুনরুত্থান ও ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও গুরুত্ব।

প্রথম অধ্যায়

তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য সম্পর্কিত অলীক কাহিনী ও স্বায়ত্বশাসনের দাবী প্রসঙ্গ

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পিছনে প্রধান যে তত্ত্বকথা ও যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছিল তা ছিল দু'অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দৃশ্যমান বৈষম্য ও বিভিন্নতা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে দেখানো হয় পশ্চিম পাকিস্তানী জনগোষ্ঠীর শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন না থাকার বিষয়টিকেও সেই কল্পিত বৈষম্যের প্রচারণার সাথে যুক্ত করা হয়।

আপাতদৃষ্টে বৈষম্যের যে চালচিত্র দেখানো হয়, ষাট- এর দশকের শেষ দিকে প্রাপ্ত কিছু সংখ্যা ও সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে। এর মধ্য উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের তথা কেন্দ্রীয় সুপিরিয়ার সার্ভিস (সিএসএস) ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কম থাকা। উপস্থাপিত পরিসংখ্যানে এটাও দেখানো হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় উন্নয়ন খাতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কম অর্থ বরাদ্দ করা। যদিও উপস্থাপিত ঐ পরিসংখ্যান অসত্য ছিলনা; কিন্তু জনগণের সামনে যে ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ এবং প্রচারণা সেই পরিসংখ্যান নিয়ে চালানো হয়েছে, তা মোটেই সত্যি ও বাস্তব নির্ভর ছিল না। ঐসব পরিসংখ্যানকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ ও প্রচারণা সর্বোতভাবে সত্যি ছিল না; হয়তো কিয়দাংশ ছিল ব্যতিক্রম এবং তাও ছিল অর্ধ সত্য।

সীমারেখা

কোন ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ কখনও করা সম্ভব নয়, যদি সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর ব্যাপক তথ্যপঞ্জী নির্দেশিত না হয়; বিশেষত যথার্থ ও বাস্তব সীমারেখা র্নিনীত না হয়। আসলে বিশ্বাসযোগ্য কোন বিশ্লেষণ এক দেশদর্শী দর্শন দিয়ে সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় কোন শুন্যতার মধ্যেও। দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার পুরো থিসিসটাই এর উদগাতারা প্রণয়ন করে ব্যাপক ভিত্তিক কোন তথ্যপঞ্জী নির্ভর সীমারেখা ছাড়াই। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ছিল বাস্তবে দুটি অসম ভৌগলিক অবয়ব। কিন্তু ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান হবার সময় এই দুটি অসম ভৌগলিক অবয়বকে অস্বীকার করে দুটির সামগ্রিক কাঠামোর সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান- যা ব্রিটিশ আমলে পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল

এবং যা তদানীন্তন ভারতের যে কোন অঞ্চলের চাইতে ছিল পশ্চাদপদ, যা কারুরই অজানা থাকার কথা নয়। পূর্ব পাকিস্তানের নতুন রাজধানী ঢাকার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী, লাহোর ও অন্যান্য শহরের একটি তুলনা করতে গিয়ে এক সময়ের পূর্ব বাংলা সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ সাংবাদিক- লেখক এইচ.এম আব্বাসী লিখেন: 'ঢাকা যখন রাজধানীতে পরিণত হয় তখন সেখানে মুসলমান কিংবা হিন্দু মালিকানায় একটি সংবাদপত্রও প্রকাশিত হতোনা। মাত্র ৫ ওয়াটের একটি রেডিও ষ্টেশন ছিল এবং বেশ কয়েক বছর সময় লাগে সেখান থেকে বাংলা দৈনিক আজাদ ও ইংরেজী দৈনিক মনিং নিউজ প্রকাশনা শুরু হতে। আমার একটা বড় দায়িত্ব ছিল পত্রিকার ছবি ব্লক করে করাচী থেকে বিমান যোগে তা ঢাকায় প্রেরণ করা যা নতুন ইংরেজী দৈনিক অবজারভার- এ প্রকাশিত হতো অর্থাৎ ঢাকায় ব্লক বানানোর কোন মেশিনও ছিল না।[১]

এটা রীতিমত অবিশ্বাস্যকর। পূর্ব পাকিস্তান তার জীবন শুরু করে বলা যায় সম্পূর্ণ পথ হাতড়িয়ে, অর্থনৈতিক ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রদেশটির কোনই অবকাঠামো ছিল না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল মোটামোটি শিল্প সমৃদ্ধ এবং ছিল সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক অব কাঠামো। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সর্ব বিবেচনায় পশ্চিম পাকিস্তান ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় অনেক অগ্রসর।'

উৎপাদনশীলতা

বস্তুতঃ একটি দেশের জনগোষ্ঠীর অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর সে দেশের উৎপাদন ও উন্নয়নশীল কাজকর্ম নির্ভরশীল। এই ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের আচার, অভ্যাস-এ ছিল মৌলিক ও দুস্তর ব্যবধান; যা আজও একই অবস্থায় রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানীরা ছিল অভ্যাসে অলস প্রকৃতির আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা হচ্ছে অভ্যাসগতভাবে অত্যন্ত পরিশ্রমী। যে কোন ধরণের বিজ্ঞানসম্মত এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। কিন্তু এই বাস্তবতা পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে স্পষ্টতই মনে হয় যে, সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিবীদ ও তাদের অনুসারীরা সেই বিষয়টি আমলে নেয়নি অথবা কথিত বৈষম্য বা শোষণ বন্ধের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেই বাস্তবতা অস্বীকার করা হয়। পরবর্তী অংশে আমি এই সব

[১] এইচ,এম, আব্বাসী (অনলুকার- এ জার্নালিষ্ট), ওভার এ কাপ অব টী, মাশহুর অফসেট প্রেস, করাচী, ১৯৭৪ পৃ : ৪৬২

বিষয়ে আলোকপাত করবো এবং বিশেষভাবে আলোকপাত করবো পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ২৩ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে তথাকথিত শোষণ করার রহস্য উদঘাটনের দিকে।

বিবেচনার ভিত্তি সাল- ১৯৪৭

১৯৪৭ সালের বাস্তব চিত্র কি ছিল ? পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগনই ছিল গরীব। বৃটিশ যুগের পূর্ব বাংলায় বসতি স্থাপনকারীদের জীবনের মান ছিল অতি নীচে। এর সুস্পষ্ট কারণ ছিল পূর্ব বাংলা বৃটিশদের কলোনী হিসেবে শোষিত ও নিগৃহীত হয়েছে ১৯০ বছর তথা ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে বৃটিশদের কলোনী ও শোষণের সময়কাল ছিল ৯০ বছর। প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৮৫৮ সালে বৃটিশ রাণী ভিক্টোরিয়া পুরো ভারতের কর্তৃত্ব গ্রহণের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এটা মোটেই অবিশ্বাস্য নয় যে, বৃটিশদের শাসনামলে পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক বেশী শোষিত ও নিগৃহীত হয়েছিল। বিদেশী শাসন- শোষণ ছাড়াও পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাদের স্বদেশীদের দ্বারাও বৃটিশ শোষণ থেকে কম নির্যাতিত ও শোষিত হয়নি। জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ভূমির প্রায় নিরঙ্কুশ মালিকানা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের। ১৯৪৭ সাল নাগাদ তারা ৮০ শতাংশ ভূমির মালিক ছিল।[২]

এই পরিসংখ্যান কোন কল্পিত কিছু নয়। এটা সেই সময়কার হিন্দু মহাসভার নেতা ডা. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর প্রদত্ত তথ্য থেকেই পাওয়া যায়। বৃটিশ শাসনামলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস সহ কোন উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত পেশায় প্রবেশের সুযোগ ছিল না এবং সেনাবাহিনীতে ছিল একেবারেই নগন্য সংখ্যক পূর্ব বাংলার মুসলমান।

১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের পর

রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়াদি পূর্ব বাংলার জন্য কোন অকস্মাৎ ঘটনাপ্রবাহ ছিলনা। বস্তুতঃ এটা ছিল এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া- যার পূর্ণতা রূপ লাভ করে

[২] ঐ পৃ: ৪৬১ পোট্রেট অব এ মার্টায়ার জাইকো পাবলিশিং হাউস, বোম্বে, ১৯৬৯ বইতে বি, মাধোক তা উদ্ধৃত করেন

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে। সেই যুদ্ধে পূর্ব বাংলায় মুসলিম শাসনের পতন ও অবক্ষয়ের সূচনা করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পাশাপাশি তারা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও হারায়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জীবনে চরম দুরাবস্থা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এক সময়ের খাজনা আদায়কারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাধে রাতারাতি স্থায়ী জমিদারে পরিণত হয়। তারা বছর প্রতি অতি নগণ্য পরিমাণ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে প্রচুর ভূ সম্পত্তির মালিক বনে গিয়ে সামন্ত প্রথার দ্বারা গরীব কৃষকদের জীবনে অবৈধ শোষক- এর স্থান লাভ করে। এই নতুন ভূ- সম্পত্তির মালিক শ্রেণী ছিল হিন্দুরা। তারা পূর্ব বাংলার কৃষকদের নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে। কৃষকদের মধ্যে বিশেষত ছোট- খাট ভূ- সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে বিরাট অংশ ছিল মুসলমান যারা অল্পকালের মধ্যেই তাদের ভূ- সম্পত্তি হারিয়ে জমি হারা সাধারণ কৃষকে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রায়ত (সাধারণ মানুষ) দেরকে জমিদারদের শোষণ নির্যাতন থেকে রক্ষার কোন ব্যবস্থাই রাখেনি। যার ফলে পূর্ব বাংলার কৃষকরা মারাত্মক শোষণ ও নির্যাতনে সর্বশ্রান্ত হয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে স্থাপিত ঋণ সালিসী বোর্ড তাদের এই দুরাবস্থা নিরসনে কিছুটা স্বস্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

১৯৪৭ সালে তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাল অবস্থা

বৃটিশ শাসনামলে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি ভোগদখল ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সেখানে পূর্ব থেকেই একটি শক্তিশালী সামন্ত শ্রেণী ছিল, যারা সেখানকার কৃষক সম্প্রদায়কে নানাবিধভাবে শোষণ করতো। তবে সেখানকার কৃষক সম্প্রদায়ের কিছুটা অনুকূল অবস্থাও ছিল। তাদের জীবন ব্যবস্থায় ছিল অত্যন্ত গতিময়তা। ফলে কোন এলাকা তাদের জীবন- ধারণের জন্য কষ্টকর হয়ে উঠলে তারা নতুন চাষযোগ্য ও চারণ ভূমিতে স্থানান্তরিত হতে পারতো; কেননা পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক সম্প্রদায় সেখানকার সামন্ত শ্রেণীর শোষণ পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক সম্প্রদায়ের তখানকার জমিদার শ্রেণীর শোষণের চাইতে কমই ভোগ করতো। অর্থাৎ বৃটিশ শাসনামলে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েক সম্প্রদায় পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক সম্প্রদায়ের চাইতে অর্থনৈতিকভাবে ভাল অবস্থায় ছিল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতা

মুসলমানরা বৃটিশ আমলে সম্মানজনক কোন পেশা লাভের জন্য অপরিহার্য আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ না করায় তাদেরকে কৃষি কাজের উপরই নিজেদের জীবন নির্বাহ করতে হতো। সেই সময় মুসলমানদের পেশাগত অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আজিজুল হক এই মর্মে একটি তথ্য প্রদান করেন যে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল দুইজন বেতনভোগী মুসলমান কর্মচারী রয়েছেন। একজন তিনি নিজে আর একজন হচ্ছেন তার চাপরাশী। এটা হয়তো কোন বিবেচনায় অতিরগুন বলে মনে হলেও মুসলমানদের পেশাগত দুরাবস্থা যে কত চরমে পৌঁছেছিল তা নিয়ে তো সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বস্তুতঃ একজন নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষক পরিস্থিতির একটা বিশ্বাসযোগ্য তুলনা নিরুপণের স্বার্থে কি এমন রূঢ় বাস্তব তথ্য বিসৃত হতে পারে? একজন পঙ্গু শিশুর উৎপাদনক্ষম যোগ্যতা এবং জীবনী শক্তির সাথে কি শারিরীকভাবে অত্যন্ত সামথ্যবান এবং মানসিকভাবে পরিপক্ক একজন বয়স্ক লোকের ক্ষমতা ও যোগ্যতার সাথে তুলনা হতে পারে ?

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং উৎপাদন ক্ষমতার বিপর্যয়

বন্যা, জলোচ্ছ্বাস এবং সাইক্লোন- এর ধকল পূর্ব পাকিস্তানে নিয়মিতভাবে সংঘটিত হওয়ায় এর অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হবার বিষয় সর্বজনবিদিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ চরিত্রগতভাবে ছিল অলস যার পরিণাম ছিল অল্প উৎপাদনশীল অর্থনীতি। আবার উষ্ণ আবহাওয়াকে অত্যুল্প শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য দায়ী করা হবে প্রকৃত পরিস্থিতি থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়া। নতুন নতুন উদ্ভাবনমূখী শিল্প- কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ না থাকায় পূর্ব বাংলার উন্নয়নের গতি ছিল অত্যন্ত কম। কম উৎপাদনশীল পূর্ব বাংলার জনগণকে উৎপাদনশীল পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা শোষণ করার অজুহাত ধোপে টেকার মত নয়; কেননা যারা নিজেদের খাওয়া পরার উপযোগী পরিমাণের চাইতে বেশী বা উদ্বৃত্ত কোন কিছু তাদের শ্রম দ্বারা উৎপাদন করতে অভ্যস্থ ছিলনা তাদেরকে অন্য কোন জনগোষ্ঠী এসে শোষণ করবে এটা কোন তথ্য বা পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝানো রীতিমত দুস্কর।

শোষণমুলক আর্থ- সামাজিক বাস্তবতা এবং বাহিক্য অবস্থা

যে কোন দেশ বা অঞ্চলের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা থেকেই সেখানকার শোষণমূলক অবস্থা উৎসারিত হয়। এটা আবার সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়ার সাথেও সরাসরি সম্পৃক্ত। উৎপাদন প্রক্রিয়া, বাজার ব্যবস্থাপনা, বিতরণ পদ্ধতি এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ শোষণ যন্ত্রকে প্রভাবান্বিত করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সব কিছু রাতারাতিভাবে পরিবর্তন করা যায়নি। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার পরিবর্তন সংঘটন স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্ভবও নয়। ফলে শোষণমূখী উপনিবেশিক আমলের পদ্ধতিই বহাল থাকে যা শত শত বছর ধরে সক্রিয় ছিল। সন্দেহ নেই যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছিল একটি বিপ্লব কিন্তু স্বাধীনতার পর আর্থ- সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে সেই বিপ্লবের আদর্শকে অব্যাহত রাখা যায়নি আভ্যন্তরীন দুর্বলতা এবং বৈদেশিক চাপ এর কারণে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম লাভের সাথে সাথেই এমন আশাংকা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল যে কয়েক মাসও দেশটি টিকতে পারবে কিনা। কেননা বৈরী ও আগ্রাসী প্রতিবেশী ভারতের অব্যাহত হুমকিতে দেশটির স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৭ সালের পর ভারতের বলপূর্বক জুনাগড়, কাশ্মীর, হায়দারাবাদ সহ বহু রাজ্য দখলের পর পাকিস্তানকে সর্বদাই সর্তক থাকতে হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সংহত করা এবং ভারতের সম্ভাব্য আগ্রাসন মোকাবেলায় নিজেদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা।

সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের কম প্রতিনিধিত্ব থাকার পটভূমি

কথিত বৈষম্যের প্রমাণ হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের কম প্রতিনিধিত্বের অভিযোগ ছিল তখনকার সময়ে একটি জনপ্রিয় শ্লোগান। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩ লক্ষ সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। এই সংখ্যা দেশের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য চিত্রিত করে। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তবানুগভাবে বিষয়টির মূল্যায়ন করতে হলে কেহই ১৯৪৭ সালে সেনাবাহিনীতে বাংলাভাষী মুসলমান সৈনিকদের সংখ্যা কত ছিল এই হিসাবের দিকে অবশ্যই দৃষ্টিপাত করবে। পাকিস্তানের শুরুতে ফেডারেল সেনাবাহিনীতে বাংলাভাষী মুসলমান সৈনিকের সংখ্যা ছিল শ'কয়েক বা কোন অবস্থাতেই এক হাজারের বেশী নয়।

সেনাবাহিনীতে বাংলাভাষী মুসলমানদের সংখ্যা অতি নগণ্য হওয়ার ঐতিহাসিক কার্যকরণ রয়েছে। বৃটিশ আমলে বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে

সেনাবাহিনীতে নেয়া হতোনা। আবার বাঙালি মুসলমানরাও বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে খুব একটা যেতোনা। সেনাবাহিনীতে বাঙালি মুসলমানদের এমনিতর দূরাবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হেতুই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাঙালি তথা বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানীদের পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে সেনা সার্ভিসে তাদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য অনুরোধ জানান। যাই হোক, পাকিস্তানের ২৩ বছরে এক হাজার বাঙালি থেকে সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ হাজার- এ, যার বৃদ্ধি সূচক হচ্ছে চার হাজার শতাংশ। এই তুলনায় সেনাবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির হার ছিল অনেক কম। ঐ সময়ে ৫০ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭১ সনে দাঁড়ায় ২,৬০,০০০ যার বৃদ্ধিসূচক হচ্ছে ১২০০ শতাংশ। অর্থাৎ তুলনামূলক বিবেচনায় সেনাবাহিনীতে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২৮০০ শতাংশ বেশী। বিভিন্ন প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে সেনাবাহিনীতে চাকরী নেয়ার ব্যাপারে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এক ধরণের ভীতি বরাবরই কাজ করতো। ফলে দেশের জনগোষ্ঠীর বড় অংশ হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে তাদের তেমন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছিলনা। ১৯৪৮ সালের হিসাব মতে সেনাবাহিনীতে চাকরীর জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রার্থী ছিল ২৭০৮ জন; আর পূর্ব পাকিস্তানের আবেদনকারী প্রার্থী ছিল মাত্র ৮৭ জন; অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানী প্রার্থী ছিল ৩০০ ভাগ বেশী। ১৯৫১ সালে সেনাবাহিনীতে চাকুরী প্রার্থী পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল ১৩৪ আর পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল ১০০৮ জন। ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা একটু বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৫ জনে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল ২০০ গুণ বেশী অর্থাৎ ৩২০৪ জন। আবেদনপত্র দাখিল কিংবা সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য কিংবা ডিসক্রিমিনেশান থাকার গালগল্প হয়তো কেউ দাঁড় করাবেন, যা কিছুতেই প্রমাণযোগ্য নয়।

এটা অবশ্যই সবার জানার কথা যে সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে দরকার কঠোর ও অব্যাহত প্রশিক্ষণ যা দিন কয়েক এবং মাস কয়েকের ব্যাপার নয়। পৃথিবীর কোন দেশের পক্ষেই জেনারেল এর চাইতে অনেক নিচের একজন সেনা অফিসারকেও ২৫ বছরের কমে তৈরী করা সম্ভব নয়। ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের দুই জন অফিসারের নাম

উল্লেখ করার মত হয়ে উঠে এর একজন ছিলেন কর্ণেল ওসমানী এবং আর একজন ছিলেন মেজর গনি। অথচ ঐ সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব ও পাঠানদের মধ্য থেকে বহু সৈনিক জেনারেল পদে পর্যন্ত উন্নীত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি পদে কর্মরত থাকাকালে আইয়ুব খান ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জনেচ্ছু ছাত্রদের এক সমাবেশে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার আহবান জানান। কিন্তু তাদের নিকট থেকে তেমন উৎসাহব্যাঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়নি। এর পরের দুই বছরের পরিসংখ্যানে তা স্পষ্ট। ১৯৫৬ সালে সেনাবাহিনীর অফিসার পদে আবেদনকৃতদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল মাত্র ২২ জন; অথচ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছিল ১১০ জন। ১৯৫৭ সনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আবেদন করার সংখ্যা ৮০ শতাংশ উন্নীত হয়ে দাঁড়ায় ৩৯ জনে, অথচ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আবেদনকারীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১১০ থেকে ২৯৪- তে।[৩]

পাকিস্তান সৃষ্টির ১০ বছর পরও সেনাবাহিনীতে চাকরী নিতে বাঙালি মুসলমানরা ছিল অত্যন্ত লাজুক ও পশ্চাৎমুখী। অথচ ঐতিহ্যগতভাবে যোদ্ধার জাত পাঞ্জাবী, পাঠান আর বেলুচীরা সেনাবাহিনীর চাকরীর প্রতি ছিল অত্যন্ত আগ্রহী। বস্তুতঃ ভারতের উত্তর- পশ্চিমাঞ্চলে বৃটিশ শাসনের শুরু থেকেই তারা পেশাগতভাবে সেনাবাহিনীর চাকরী গ্রহণে করাতে উৎসাহ জ্ঞাপন করে। সশস্ত্র বাহিনীর চাকরীতে ২৩ বছর ধরে বাঙালি মুসলমানদের অনুৎসাহিত করা কিংবা পরিকল্পিতভাবে বাদ দেয়া হয়ে থাকলে গত ৩৭ বছরেরও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সম সংখ্যক অবস্থায় যেতে পারলনা কেন ? ১৯৯৬ সনে পাকিস্তানের জনসংখ্যা যখন ১৩ লক্ষ তখন সেখানকার সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল যখন ৬ লক্ষ অথচ বাংলাদেশের সেনা সদস্য সেই সময় ছিল বড় জোর এক লক্ষ। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেদের সম্পদ দ্বারা প্রচুর অস্ত্র- সস্ত্র সংগ্রহ এবং আনবিক সামর্থ্যরে অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ কেন সামরিকভাবে এত পিছনে পড়ে থাকলো ? ৩৭ বছর পরও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৬ ভাগের একভাগে পর্যবসিত হয়ে থাকলো ? এছাড়াও বাংলাদেশের আনবিক শক্তি অর্জনের লক্ষ্য হয়তো আরো বহু দিন ধরেই তিমিরে থেকে যাবে। উল্লেখ্য যে ষাট দশকের ৬- দফা দাবীর সেই ফুলঝুরির কি হলো -যে দাবী নামাতে ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিরোধে পূর্ব পাকিস্তানের পর্যাপ্ত

[৩] এইচ,এ, রিজভী, মিলিটারী এন্ড পলিটিক্স ইন পাকিস্তান, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, লাহোর (পাকিস্তান), ১৯৭৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ: ১৮১- ৮২

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও শক্তিশালী মিলিশিয়া গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল ? এটা কি সত্যি নয় যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে ভারত কেবল ভয় দেখিয়েই বাংলাদেশের উপর কর্তৃত্ব করে চলছে। কেন বাংলাদেশ ৩৭ বছরেও ভারতের হুমকি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলেও তেমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত সম্পদ ও সামর্থ বাংলাদেশের নেই। এটা আজ কোন অবস্থাতেই কোন গোপন তথ্য নয় যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যা কিছু সামরিক সরঞ্জাম রয়েছে তার মধ্যে বিরাট অংশ পাকিস্তান থেকে এসেছে প্রায় বিনা পয়সায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের সামরিক শক্তির সামনে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে।

সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সম্পদ ও ভিত্তি

কঠিন বাস্তবতা বরাবরই নির্জলা সত্যকে উদঘাটন করে। বাস্তবে বাংলাদেশের রয়েছে সম্পদ সংকট। যার দরণ দেশটির পক্ষে নাগরিকদের জন্য ন্যুনতম পুষ্টির যোগান, স্বাস্থ্যখাতে নাগরিকদের মৌলিক সেবা প্রদান, এমনকি প্রাইমারী পর্যায়ের স্কুল- বয়সী শিশুদের শিক্ষাক্রম চালনাও সম্ভব হয়না। এই যেখানে বাংলাদেশের অবস্থা সেখানে পশ্চিম পাকিস্তান এই অভাবক্লিষ্ট দেশ থেকে কি সম্পদ লুট করেছে?

বস্তুতঃ ষাট এর দশকে তারস্বরে চালানো বৈষ্যম্যের প্রচারণা ও পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার অভিযোগ ছিল নিদারুণ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণামূলক। সে কারণে প্রখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক যিনি ভারতে মোঘল শাসনের ইতিহাসের অন্যতম বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য, সেই প্রফেসার এল এফ রুশব্রুক উইলিয়াম তার লিখিত দি ইস্ট পাকিস্তান ট্রাজেডী[৪] বইয়ে বেশ বাগ্মীতার সাথেই প্রশ্ন করেছেন যে পাকিস্তান যুগের ইতি হওয়ার পরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কিংবা শেখ মুজিবের সোনার বাংলা কেন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য দু- স্বপ্নই রয়ে গেল? বস্তুতঃ এটা পাকিস্তানের তথাকথিত শোষণের জন্যে নয়; এর কারণ ইতিহাস বিধৃত যৌক্তিকতার মধ্যেই নিহিত। আসলে পূর্ব পাকিস্তান ২৪ বছর ধরে সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক অনগ্রসর ছিল। ১৯৭১ এর পরও দেশটির আর্থিক অবস্থা এবং বিভিন্ন ধরণের আভ্যন্তরীণ শোষণ- এর তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বাংলাদেশ কেবল যে পরিবর্তনটি দেখাতে পারে তাহলো দেশটির পতাকা; কিন্তু তার মধ্যে এমন

[৪] এল,এফ, রুশব্রুক উইলিয়াম, দি ইষ্ট পাকিস্তান ট্র্যাজেডী টম ষ্ট্যাসি লিঃ, লন্ডন, ১৯৭২, পৃ: ২২

কিছু পরিস্ফুট করানোর চেষ্টা করা হয়েছে যা দেশের বৃহত্তর মুসলমান জনগোষ্ঠীর চিন্তা- চেতনা ও বিশ্বাসের পরিপন্থী। সাধারণ মানুষের ভয়াবহ দরিদ্রতা অব্যাহত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ইনস্টিটিউটের আশির দশকের এক জরীপ[৫] মতে দরিদ্রসীমার নীচে দেশটির ৭৬ শতাংশ মানুষের অবস্থান। এর সাথে যোগ হবে দেশে অবস্থানকারী আড়াই লক্ষ দুভার্গ্যপীড়িত আটকে পড়া পাকিস্তানীদের নিগ্রহের জীবন; যারা গত ৩৭ বছর ধরে বন্দী শিবিরে মানবেতর জীবন নির্বাহ করছে। আরো লক্ষ লক্ষ বস্তিবাসী একইভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে দেশের সকল শহরাঞ্চলে, যাদের সংখ্যা এক মাত্র ঢাকা নগরীতেই ৩৫ লক্ষ বলে ধারণা করা হয়। যদিও অতি ক্ষুদ্র একটি স্বচ্ছল অংশের অভ্যুদয় বাংলাদেশে ঘটছে, কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্টীর মাথাপিছু আয় পাকিস্তানীদের মাথাপিছু আয়ের প্রায় অর্ধেকে পর্যবসিত হয়ে আছে। ১৯৯৬ সালের এক পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ছিল ২২০ ডলার আর পাকিস্তানীদের ছিল ৪৪০ ডলার।

অথচ সেই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ বছরে পাকিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বাংলাদেশের (২.২%) চাইতে বেশী (২.৪%)। অতি ন্যুনতম মুজুরীতে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দেশ ও বিদেশে কাজ করছে। বিশ্বের শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রম হচ্ছে সব চাইতে সস্তা। পাকিস্তানের করাচীতে প্রায় ১৫ লক্ষ অবৈধ বাংলাদেশী বিভিন্ন ধরণের বিদঘুটে পেশায় অতি অল্প মুজুরীতে দিনাতিপাত করছে।

কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস- এ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গে

কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ- এর সম্মিলিত প্রতিনিধিত্বের চাইতে অনেক কম। এর পাশাপাশি আর একটি বাস্তবতা ছিল পাঞ্জাবী নয়, পশ্চিম পাকিস্তানীদের এমন প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাও ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এটা ইতিহাসিক বাস্তবতা তথা বাঙালি, সিন্ধী, পাঠানী ও বেলুচীদের ঐতিহাসিক অনগ্রসরতারই ফল। পাঞ্জাবে বসতি গড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম মোহাজেররা ছিল পূর্ব বাংলা, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনগোষ্ঠীর চাইতে পড়ালেখায়

[৫] কে, আহমেদ এন্ড এন, হাসান (ইডি), রিপোর্ট অব দি নিউট্রিশান সার্ভে অব ১৯৭৫- ৭৬ এন্ড ১৯৮১- ৮২, ইনষ্টিউটিউট অব ফুড এন্ড নিউট্রিশান, ইউনির্ভাসিটি অব ঢাকা, ১৯৮৩ পৃ: ১৫, ২৮ ও ২০০৫

অনেক অগ্রসর। শিক্ষা- দীক্ষায় শেষোক্ত জনগোষ্ঠীর তুলনামূলক অনগ্রসতার কারণ ছিল অর্থনৈতিক এবং কিছুটা সামাজিক। বস্তুতঃ পূর্ব বাংলা, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম সিকিতে। কিন্তু পাঞ্জাব ও অন্যান্য অঞ্চলের মোহাজের মুসলমানরা আধুনিক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের বলা যায় পর পরই। অর্থাৎ তারা পাকিস্তানের অপরাপর অঞ্চলের মুসলমানদের চাইতে শিক্ষা- দীক্ষায় ছিল ৭০ থেকে ৮০ বছরের অগ্রে। এর প্রধান কারণ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ৭০ এর দশকে স্যার সৈয়দ আহমেদেরর নেতৃত্বে আলীগড়ে প্রতিষ্ঠিত এঙ্গলো মহামেডান কলেজ ভারতের বধিষ্ণু অঞ্চলের মুসলমানদেরকে উচ্চ শিক্ষায় আকৃষ্ট করে তোলে। পাশাপাশি লাহোর সরকারী কলেজ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বহু আগে। ১৮৫৭ সালে স্থাপিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেগুলোতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল অনুল্লেখ্য; এমনকি ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্যত মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও মুসলিম ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। হিন্দু ছাত্র ও শিক্ষকরা ছিল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে কেবল ১৯৪৭ সালের পর, যখন পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ও শিক্ষকতার ফুরসত পায়। সত্যিকার অর্থে শিক্ষা- দীক্ষায় বাংলার মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণেই বৃটিশ যুগের ভারতীয় সিভিল সার্ভিস তথা আইসিএস- এ কোন বাঙালি মুসলমানের ঢোকার যোগ্যতা ছিলনা; যদিও উক্ত সার্ভিস ১৮৫৩ সালের অধ্যাদেশ[৬] বলে ১৮৫৪ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল। ফলে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের প্রশাসন প্রায় মাত্র ১০০ জন প্রাক্তন আইসিএস অফিসার আর ভারত পায় ৫০০ জন। প্রাপ্ত ১০০ জনের মধ্যে একজনও বাঙালি কিংবা পাকিস্তানের অন্যান্য অনগ্রসর এলাকার ছিলনা।

ঐ ১০০ জনের মধ্যে কেউ কেউ ছিল বৃটিশ বংশোদ্ভুত মুসলমান, কেউ ছিল শিক্ষায় অগ্রসর ভারতের অপরাপর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীভূক্ত। সঙ্গত কারণেই তারা ছিল পাঞ্জাব বা ইউপি'র মুসলমান।

পাঞ্জাব ও ইউপি'র মুসলমানদের অগ্রসরতা আর পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অনগ্রসরতার আরো প্রমাণ আছে। ১৮৮৬ সালের এক পরিসংখ্যানে

[৬] আলী আহমেদ রোল অব হায়ার সিভিল সার্ভিস ইন পাকিস্তান, লাহোর, পৃ: ৩৫

দেখা যায় আইসিএস অফিসারদের মধ্যে পাঞ্জাবের ছিল তিন জন মুসলমান, শিখ ছিল দুই জন এবং হিন্দু ছিলনা একজনও; এমনকি মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ এলাকা অযোধ্যার ৫ জন মুসলমান ছিল আইসিএস আর তার বিপরীতে ছিল ছয় জন হিন্দু। অথচ বাংলা মুসলমান সংখ্যাঘরিষ্ঠ অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও মাত্র দুই জন মুসলমান ছিল আইসিএস, আর ৯ জন ছিল হিন্দু।[৭]

কিন্তু সে সময়ে দুইজন বাঙালি মুসলমান আইসিএস এর পরিসংখ্যান পাওয়া গেলেও তাদের মূল আবাস বা ঠিকানার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তবে এটা মোটামোটি বলা যায় যে, তারা কেউ পূর্ব বাংলার বাসিন্দা ছিলনা। এবং এটাও অনেকটা নিশ্চিত যে তারা হয়তো বাংলাভাষী মুসলমানও ছিলনা। সেই সময়কার বাংলার শিক্ষিত মুসলমান পরিবারসমূহ যেমন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর পরিবার কখনও নিজেদেরকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতনা। হয়তো ১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়াটা ছিল মর্যাদা হানিকর।

১৯৪৭ সালের সিএসএস- এ মনোনীত একজন পূর্ব পাকিস্তানী

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এক সময় আইসিএস সার্ভিসে শুধু মনোনীত একজন বাঙালি মুসলমান জনাব নুরুন্নবী চৌধুরীকে পাওয়া যায়। ফলে পাক প্রশাসনে উদ্ভূত বিশাল শুন্যতা পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের অফিসারদেরকে দিয়ে পুরণ করতে হয়েছে। তবে প্রতিযোগিতা নয় ১৯৪৯- ৫০ সালে প্রবর্তিত ৪০ শতাংশ কোটার ভিত্তিতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সার্ভিসের পূর্ব পাকিস্তানীদের স্থান লাভ শুরু হয়।[৮]

সেনাবাহিনীতেও একইভাবে পাকিস্তানের অপরাপর অঞ্চলের চাইতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সার্ভিসে নিয়োগ দেয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে কাকেও পাওয়া যায়নি; অথচ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আট জনকে পাওয়া যায়।

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাওয়া যায় দুই জনকে, একজন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাওয়া যায় ১৬ জনকে (যার মধ্যে ৭ জন ছিল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং ১০ জন ছিল ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের। ১৬ বছরের ব্যবধানে ১৯৬৪ সালে

[৭] ঐ পৃ: ৪৫

[৮] আর, সায়মন্ডস, দি বৃটিশ এন্ড দেয়ার সাকসেসারস ফেবার এন্ড ফেবার, লন্ডন ১৯৬৬ পৃ: ৮৮- ৯০

সিএসএস- এ পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯ জন (১৫ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের) আর পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ জন (১৩ জন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের)। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের তুলনায় ১০ গুণ।[৯]

পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এত দ্রুত হারে ঘটেছিল যে তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে যায়। যার দরুণ ১৯৭০- ৭১ সালে বহু বাঙালি অফিসারই পাকিস্তান প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী ছিল সিএসএস ক্যাডারের একজন বাঙালি। যে হারে পাকিস্তান প্রশাসনে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাতে এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, আরো ১০ বা ২০ বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যা অনুপাতে যথাযথ পর্যায়ে উপনীত হতো।

কেন্দ্র কর্তৃক উন্নয়ন বাজেট হ্রাস এবং বরাদ্দ বাস্তবায়নে অদক্ষতা প্রসঙ্গ

কোন কোন অদূরদর্শী লেখকের প্রণীত পরিসংখ্যানে কেন্দ্র কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে কম বিনিয়োগের কথা সন্নিবেশিত করা হয়। ঐ সব পরিসংখ্যানের কিছু কিছু দৃশ্যত সত্য বটে; কিন্তু ষাট এর দশকের শেষ দিকে উভয় প্রদেশের বরাদ্দের অসমতা ক্রমশই হ্রাস পেতে শুরু করে।[১০]

জনৈক রহমান সোবাহানের মতো কিছু কিছু তথাকথিত ঋজু অর্থনীতিবীদ যারা বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভে সমর্থন হয়নি, তারাই বিদ্বেষী মনোভাব প্রসুত মনগড়া ঐ সব পরিসংখ্যান সন্নিবেশন করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার যে কোন বিনিয়োগ কর্মে দরকার প্রয়োজনীয় জমি। পূর্ব পাকিস্তান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় সাত গুণ ছোট। স্বভাবতই পশ্চিম পাকিস্তানের দীর্ঘ সড়ক ও রেল পথ নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে উঠে। আর সেখানে ছিল শিল্প- কারখানা স্থাপনের অবারিত সুযোগ।

এ ক্ষেত্রে বৃটিশ আমলের শুরু থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা ও তার সাথে যুক্ত সেচ খাল সমূহের ব্যবস্থাপনায় ও সে সব চালু রাখার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থ। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানের ছোট- খাট কৃষি ইউনিট

[৯] রাল্ফ ব্রেনবান্তি (ইডি) দি ব্যুরোক্রেসী অব পাকিস্তান, এশিয়ান ব্যুরোক্রেটিক সিষ্টেম ইমার্জেন্ট ফ্রম বৃটিশ কলোনিয়াল ট্রাডিশান, ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় কমনওয়েলথ ষ্টাডি সেন্টার, ইউএসএ, ১৯৬৬ পৃ: ২৬৬- ৬৭ এবং ২৭০- ৭১

[১০] এল.এফ. রুশ বুক উইলিয়ামস পূর্বে উদ্ধৃত বই পৃ: ১০৮- ৯

সমূহেও সাথে সাথে হয়তো আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভরতা ও বিনিয়োগের প্রয়োজন হতো।

অর্থাৎ বৃহত্তর এলাকা হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানে তার অবকাঠামো ঠিক রাখার জন্যে যে বিনিয়োগের প্রয়োজন হতো এবং তা তারা কাজেও লাগাতো পারতো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সে অবস্থা ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ছিলনা। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনায় ও বরাদ্দ ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তেমন দক্ষতা ছিলনা। এই ছাড়াও স্থানীয়ভাবে আগ্রহী শিল্প উদ্দেক্তা না থাকায় পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প উন্নয়ন বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যা কিছু শিল্প উন্নয়ন ঘটে তা প্রধানত সম্ভব হয় ৪৭ এর দেশ বিভাগের পর ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসা কিছু সংখ্যক অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিল্প উদ্যোক্তার কারণে। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্যি যে পূর্ব বাংলায় সাতচল্লিশ- এর পূর্বে কোন শিল্প ব্যবস্থাই ছিলনা। পূর্ব বাংলা প্রধানত ভারতের অপরাপর এলাকা ও ইউরোপের শিল্প- কলকারখানার কাঁচামাল সরবরাহের উৎস ও পশ্চাদভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পূর্ব বাংলায় পৃথিবীর প্রায় ৮০ শতাংশ পাট উৎপাদন হলেও একটিও পাটকল ছিলনা।[১১]

যে কয়টি পাটকল বৃটিশ আমলে শুরু করা হয় তার সবটাই ছিল কলকাতার আশ- পাশে অর্থাৎ পশ্চিম বাংলায়। পাটের বিপণন ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সাতচল্লিশ- এর দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলার পাট উৎপাদনকারীদের সম্পূর্ণভাবে কলকাতা কেন্দ্রিক পাট ব্যবসায়ীদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। পাট সহ বিভিন্ন পণ্যের বিদেশ বাণিজ্য সম্পর্কে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের অনভিজ্ঞতার কারণ এই খাতে তাদের উদ্যোগ ও বিনিয়োগকে অসম্ভব করে তোলে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শিল্প উন্নয়ন দ্রুত বেগে গড়ে উঠার পিছনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর তেমন কোন অবদান ছিলনা। এটার পিছনে ছিল আদমজী- ইস্পাহানীর মত অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যবসায়ী মহলের অবদান। ১৯৭১ সালের পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর পরিস্থিতি উল্টোরূপ পরিগ্রহ করে। যার জন্যে গত ৩৭ বছরে অল্প বিস্তর শিল্প উন্নয়ন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে সম্ভব হয়েছে এবং উৎপাদনমূখী তৈরী পোষাক বাণিজ্যেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। তবে পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে ৭৬টি পাটকল চালু করা হয় অথচ বাংলাদেশের ৩৭ বছরে মাত্র ৪টি কল চালু করা হয়, যার কোনটিও পাকিস্তান

[১১] এইচ.এম. আব্বাসী, পূর্বে উদ্ধৃত বই পৃ: ৪৬৪

আমলে প্রতিষ্ঠিত আদমজীর মত বড় মাপের শিল্প নয়। পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় নয়টি চিনি কল আর বাংলাদেশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র ১টি। কিন্তু পাকিস্তান আমলের পর কটন, ষ্টীল, রিফাইনারী এবং মেশিন টুলস- এ একটি শিল্পও বাংলাদেশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে অত্যন্ত বেদনার বিষয় হচ্ছে পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের উৎপাদিত মেশিন টুলস এর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারার অভিযোগে বন্ধ করে দেয়া হয়। এটা যে কারুরই মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কারণ যাই থাকুক এটা সত্যি বটে যে বাংলাদেশ তথা ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব বরাবরই ছিল। ফলে বিশাল উন্নয়ন কর্মসূচীর অভিলাষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকার এবং শত শত বেসামরিক প্রতিষ্ঠান (এনজিও) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা মেটানো এবং আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের মধ্যেই তাদের কাজকর্ম সন্নিবেশিত করেছে।

দক্ষতা ও আগ্রহী উদ্দেক্তার অভাব

পূর্বেই বলা হয়েছে যে পূর্ব বাংলার পাট চাষীরা মূখ্যত ছিল মুসলমান; কিন্তু পাট ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো অমুসলিম ব্যবসায়ীরা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও এই অবস্থা অব্যাহত ছিল ষাট এর দশকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত। ১৯৬৫ সালের পাক- ভারত যুদ্ধ গোটা পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনে এবং সেই সময় অমুসলিম ব্যবসায়ীরা চূড়ান্তভাবে তাদের যা অর্থ সম্পদ- সামর্থ ছিল সব নিয়েই ভারতে পাড়ি জমায় এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সকল ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগকৃত এদের শত সহস্র কোটি টাকার সম্পদ ভারতে পাচার করে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে বিনিয়োগের জন্যে। শেখ মুজিব তার ৬- দফা কর্মসূচীতে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে কথিত পাচারের জন্য নিন্দাবাদ জানালেও পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ব্যবসায়ীদের দ্বারা ভারতে সম্পদ পাচারের বিষয়ে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে নীরব থাকেন। একাত্তর- উত্তর সময়ে অর্থাৎ বাংলাদেশ আমলে সেই সব হিন্দু ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ এ দেশে তাদের গোপন সাঙ্গাতদের সহযোগিতায় বিশেষত মেট্রো শহর ও বড় বড় অন্যান্য শহরগুলোকে জমজমাট ব্যবসা গড়ে তোলে। তাদের পৃষ্টপোষককতায় বহু এনজিও বাংলাদেশের উন্নয়নের নামে নানাবিধ অপতৎপরতা চালাচ্ছে যারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইন ও সরকারকে থোড়াই কেয়ার করে। এই সব

এনজিওদের নাকি বাংলাদেশের প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে প্রচুর প্রভাব। বাংলাদেশের প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভারতের কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা RAW (Research and Analysis Wing)- এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে যার দরুণ এমন আবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে ভারতীয় স্বার্থ রক্ষায় তারা নানাবিধভাবে তৎপর। তাদের বিভিন্ন তৎপরতার মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে বাংলাদেশে শিল্পায়নে বাধার সৃষ্টি করা, যাতে বাংলাদেশে ভারতের উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিত থাকে। এই বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা যাবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য সংক্রান্ত যুক্তিতে মিথ্যাচার

রহমান সোবাহানের মত অর্থনীতিবীদরা প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মুন্ডপাত করেন। এতদসংক্রান্ত যে পরিসংখ্যান রহমান সোবাহানরা তুলে ধরেন তাতে দেখানো হয় যে ১৯৭০ সনে পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিমাণ প্রাথমিক স্কুল ছিল তার চাইতে কয়েক হাজার বেশী প্রাথমিক স্কুল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। কি উদ্ভট যুক্তি ! পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে সাতগুন বৃহৎ পশ্চিম পাকিস্তানের বাস্তবতা যাতে অসচেতন পাঠকের নিকট চাপা থাকে। মুখ্যত শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা বিস্তারের শুরু থেকেই প্রতিটি মহল্লায় গড়ে উঠে এবং তা প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রতিটি শিশুর পায়ে হেঁটে অতিক্রমনীয় দূরত্বে। ফলে প্রতি ৪/৫ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে সন্নিহিত এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠার পর পরই। শিক্ষাবীদদের সংজ্ঞায় যাকে বলা হয় স্কুল মেপিং; এই বাস্তবতায় সাতগুণ বড় পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বেশী হবারই কথা। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্যি যে ইর্ষান্বিত অর্থনীতিবীদ রহমান সোবহানরা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন প্রাইমারী স্কুলের সংখা বেশী হলো তা নিয়ে শোরগোল এবং বৈষম্যের যুক্তি হিসেবে দাঁড় করালেন। অথচ ১৯৭০ সনে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার ছিল ১৯ শতাংশ আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল মাত্র ১৭ শতাংশ।

মৌলিক বা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের মাধ্যমে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির জন্যে উদগ্রীব মহল অবশ্যই এটা স্বীকার করবেন যে এর জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ভবন কিংবা বিদ্যমান ব্যবস্থাধীনে দুই বা তিন শিফটে শিক্ষাদান। বাংলাদেশের মত গরীব দেশে এমনিতরভাবেই বিদ্যমান ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যেতে পারে; যা সচেতন অর্থনীতিবীদদের ভুলে যাওয়া সমীচিন নয়।

অপ্রশিক্ষিত জনসম্পদের নিম্ন উৎপাদনশীলতা

বাংলাদেশের অনগ্রসরতা আর একটি দৃষ্টিকোন থেকে দেখা যেতে পারে। দেশটিতে সম্পদের সীমাবদ্ধতা, উন্নয়ন- প্রতিকুল আবহ এবং সার্বিক সামাজিক পরিবেশের পাশাপাশি রয়েছে জনশক্তির অদক্ষতা ও স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা। এটাই পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীকে অনেক পিছনে ফেলে দেয়, যদিও ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের দু' অংশেরই মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় সমান অর্থাৎ ১২০ মার্কিন ডলার। কিন্তু পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর ৩৭ বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতির হাল কি ? বাংলাদেশ ২০০৫ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্য লাভ করেছে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার[১২] তথা এক লক্ষাধিক কোটি টাকা যা- পাকিস্তানের ২৩ বছরে সমুদয় প্রাপ্তির চার গুণেরও বেশী। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য ২৩ বছরে ছিল মাত্র ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু বাংলাদেশ এর মাথাপিছু আয় কি সে তুলনায় বেড়েছে ?

পশ্চিমা পুঁজিবাদী ধাঁচের উন্নয়ন কার্যক্রমের ত্রুটিজনিত প্রতিক্রিয়া

তথাকথিত বৈষম্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আর একটি পয়েন্ট খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে। কিছু ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকারণ হেতু পাকিস্তানকে পশ্চিমা পুঁজিবাদী উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে পুরনো সামন্তবাদী আর্থ- সামাজিক আভ্যন্তরীণ কাঠামোর কার্যকারীতা প্রায় অব্যাহত থাকে। তেমন অবস্থায় সাধারণ্যে ন্যায়ানুগ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব ছিল কিনা এটা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে। বস্তুতঃ জাতীয় অর্থনীতির উৎপাদনের প্রধান খাত কৃষিতে সামন্তবাদী শোষণমূখী কাঠামো অক্ষুন্ন রেখে কিভাবে জাতীয় জীবনে ন্যায়ানুগ উন্নয়ন প্রতাশা করা যায় ?

বেসরকারী শিল্প খাতে যে উন্নয়ন অর্জিত হয় তাও পশ্চিমা পুঁজিবাদী মডেল এর অনুকরণে অর্জিত হয়। তবে পাকিস্তানের সামাজিক- সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি ছিল পশ্চিমা দুনিয়ার চাইতে ভিন্নতর। ফলে গরীবদের জন্যে ন্যায়ানুগ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করা ছিল প্রায়ই অনুল্লেখ্য। এটা ছিল সম্পদের সমান বা ন্যায়ানুগ বিতরণের প্রধান অন্তরায়, যদিও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক খাতে অগ্রগতি মোটামোটি দ্রুতই অর্জিত হয়েছিল। সমানুপাতিক উন্নয়ন এবং

[১২] সিরাজুল আলম খান, বাংলাদেশে গণতন্ত্র (এন অল্টারনেটিভ মডেল অব ডেমোক্রাসি ফর বাংলাদেশ) এমএনও পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ : ৫

সম্পদের সুষম বিতরণ পাকিস্তানের সাথে ভৌগলিকভাবে তুলনামূলক অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে আজ অবধি তা প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে তীব্র বঞ্চনাবোধ (মঙ্গা নামে নতুন টার্ম বা নুন্যতম খাদ্যের সন্ধান করার কোন অবকাশ বছরের এক বিরাট সময় ধরে উক্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর না থাকার কথা; এখন বছরের পর বছর ধরে বলা হয়ে থাকে) - যা বস্তুতঃ পূর্বাঞ্চলীয় জনগোষ্ঠীর সাথে দেশটির বাকী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বৈষম্যকে স্পষ্টতই দৃশ্যমান করে তোলে। বাংলাদেশের জন্মের ৩৭ বছর পর আজ এই প্রশ্ন অত্যন্ত প্রকট যে কিভাবে এই বৈষম্যের নিরসন করা সম্ভব ?

১৯৬০ দশকের বৈষম্যের শ্লোগান সাম্প্রতিক সময়ে বেরিয়ে আসা কিছু বাস্তব সত্যির আলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে পাকিস্তানের মাথাপিছু বার্ষিক আয়- এর পরিমাণ বাংলাদেশের মাথা পিছু আয়ের চাইতে বেশী, অথচ পাকিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাংলাদেশের চাইতে অনেক বেশী। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাকিস্তানের জনসংখ্যা সাড়ে ছয় কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ কোটিতে এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যা সাত কোটি থেকে ১৪ কোটিতে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানের জনসংখ্যা ২ কোটি বেশী বৃদ্ধি পায়। আভ্যন্তরীণভাবে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি প্রতি বছর প্রচুর খাদ্য শস্য আমদানী করা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ অনেক হ্রাস পায়। প্রাপ্ত তথ্য মতে বাংলাদেশে ৫ বছরের নিচে ৫৬ শতাংশ শিশু খাদ্য ঘাটতিতে আক্রান্ত যা উপমহাদেশে সর্বোচ্চ (*সাইদ সাদ আন্দালিব, ইডি পলিটিক্যাল কালচার অব বাংলাদেশ, ইউপিএল, ঢাকা- ১২০৭ পৃঃ ২৮১*)

প্রচারণার শিকার পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণী

তথাকথিত বৈষম্যের প্রচারণা কেবল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতেই ছড়ায়নি; এই উৎকট প্রচারণার শিকারে পড়ে অদূরদর্শী একশ্রেণীর পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাজ চক্র। তারা এই মর্মে যুক্তি উত্থাপন করে যে পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে একটি বোঝা।[১৩]

[১৩] হাসান জহীর সেপারেশান অব ইষ্ট পাকিস্তান, অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯৯৪ পৃ: ১৪৬-৪৭

পূর্ব পাকিস্তান- এর বোঝা তাদের ঘাড় থেকে নামানো হলে তারা অর্থনৈতিকভাবে অনেক স্বচ্ছল হবে। এদের মধ্যে ছিল কিছু আমলা, কিছু পরিকল্পনাবীদ এবং কিছু সামন্ত প্রভু। বিশেষত কয়েকজন সামন্ত প্রভু পূর্ব পাকিস্তান এর বোঝা ঘাড় থেকে নামানোর জন্য অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে -এই আশংকায় যে ৬০ এর দশকে পূর্ব পকিস্তানে গণ আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করে তা কালক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানে এদের সামন্ততান্ত্রিক অবস্থানকে গুড়িয়ে দেবে; যেভাবে ৫০ এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের এই কায়েমী স্বার্থবাজ চক্র এটা সম্পর্কে মোটেই অবগত ছিলনা যে কিভাবে বাংলার মুসলমানরা ব্রিটিশ ও তাদের স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৯৭ শতাংশ ভোট দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে; এমনকি শত দুর্বিপাক সত্ত্বেও ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্যে নির্ভীক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল (দ্রষ্টব্যঃ উইটনেস টু সারেন্ডার -সিদ্দিক সালিক, ইউপিএল, ১৯৭১ এবং আমি আল বদর বলছি, দ্বিতীয় সংস্করণ ঢাকা ২০০৭ইং)। যদি পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোনভাবে প্রভাবিত না হয়ে ১৯৭১ সালে আত্মসমর্পণ না করতো -যা নিয়াজী পরে অনুধাবন করেছিল (এ.কে. নিয়াজী, দি বিট্রায়াল অব ইষ্ট পাকিস্তান-পেপার ব্যাকস, ১৯৯৯ ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৬ , পিপি ২২৬- ২৭) তাহলে একাত্তরের পর ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। এটা কোনভাবেই বলা যাবে না যে ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে প্রদত্ত গণরায় পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায় এবং ভারতের সশস্ত্র আগ্রাসনের দ্বারা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টায় মুজিব কেন অনেক দেশপ্রেমিকও এটা তাদের ভাগ্যের লিখন বলেই মেনে নেয়।

বৈষম্যতত্ত্বের জন্ম দেয়া হয়েছিল পাকিস্তানকে ভাঙ্গার জন্যে

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের প্রকৃত যে পরিসংখ্যান (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতারণামূলক বলে প্রমাণিত হয়) তাতে উন্নয়নের যে গতি ছিল তা অব্যাহত থাকলে বৈষম্য সত্ত্বর বিদূরিত হয়ে দুই অংশের অর্থনৈতিক অবস্থা সমান রূপই পরিগ্রহ করতো। সে হিসেবে পাকিস্তান অবিচ্ছিন্ন থাকলে এত দিনে শুধু যে ১২৫ কোটি মুসলিম উম্মার নেতৃত্বেই দেশটি অভিষিক্ত হতো তাই নয়; বিশ্বের অন্যতম বৃহৎশক্তি হিসেবেও পাকিস্তান আবির্ভূত হতো। পাকিস্তানের তেমন সম্ভাবনাই ছিল ভারত ও ইহুদী চক্রের (যারা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে

সর্বমূখী মদদ যুগিয়েছিল) চক্ষুশুল। তারা দ্রুত গড়ে উঠা মুসলিম শক্তি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য সকল ধরণের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় লিপ্ত হয়।

ভারত, বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকার এক বৃহৎ শ্রেণী ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে একাত্ম হয়। তবে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে অন্যদের স্বার্থ যতটুকু ছিল তার চাইতে বেশী স্বার্থ ছিল ভারতের। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ-এ পর্যবসিত করার ভারতীয় স্বার্থ ছিল বৃহত্তর ভারতের সাথে তাকে যুক্ত করা, যা তাদের ভূতপূর্ব নেতারা তথা নেহেরু, শ্যামা প্রসাদ, প্যাটেল প্রমুখ চেয়েছিলেন।

যখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান গোটা পাকিস্তানের প্রায় সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ছিল সমান অংশীদার ঠিক তখনই পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনী আখ্যায়িত করার প্রচারণা শুরু করে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বানানোর অপতৎপরতা শুরু হয়। এই অপতৎপরতার অংশ হিসেবেই আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর মত লোকের মুখ দিয়ে বলানো হয় যে ১৯৫৬ সালেই পূর্ব পকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন ছিল ৯৮ ভাগ। যদিও সে সময়ের পূর্বেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়া হয় এবং ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত হয় জনপ্রিয় সংবিধান, যাতে দুই পাকিস্তানের সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়। অথচ দুই অংশের মধ্যকার মীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়েই তথাকথিত স্বায়ত্বশাসনের দাবীর আবডালে ভারতীয় ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের সর্বমূখী অপতৎপরতা সেই সময় চালানো হয়। পাকিস্তান শুরুর কয় বছর পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাংলা ভাষা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে কখনও বাংলা ভাষার মর্যাদা বা ব্যবহার হুমকির মুখে ছিল না। কিন্তু স্বায়ত্বশাসনবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সুযোগ পেলেই মীমাংসিত বিষয় নিয়ে হৈ হল্লা করতো। আজকের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নটা যদি কেউ করে যে ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তান যদি পাকিস্তানের কলোনী হয়ে থাকে তাহলে আজকের দুই হাজার খৃস্টাব্দের প্রথম দশকে বাংলাদেশ কাদের কলোনী ? ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা পর্যন্ত বলেছেন যে বাংলাদেশ হচ্ছে আজ ভারতীয় পণ্যের অবরুদ্ধ এক বাজার। তথাকথিত পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ১৯৭১ সালে অবসান ঘটার পর অতিবাহিত গত ৩৭ বছরেও কেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চালচিত্র আজও পাকিস্তানের পশ্চাতে রয়ে গেছে ? যে কেহ এমন প্রশ্ন কি করতে পারে না যে ৩৭ বছর আগে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুট করার পথ বন্ধ হয়ে যাবার পরও নব্বই এর দশকের শেষের দিকে কিভাবে পাকিস্তান এটম বোমা

বানালো ? বাংলাদেশ কেন অন্তত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সমকক্ষ বা কাছাকাছি সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারলোনা; যা তার অন্তর্জাতিক সীমান্তকে অনেক বৃহৎ ভারতের সম্ভাব্য সেনা আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে পারে? কেননা ১৯৭১ এর পূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের কম প্রতিনিধিত্বে ক্ষুদ্ধ ও ব্যথিত হয়েছিল বাঙালি নেতারা।

কেবলমাত্র অর্থনীতিই নয়; বাংলাদেশে ভারতের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং রাজনৈতিক প্রভূত্বগিরি এত তুঙ্গে পৌঁছেছে যে, ঢাকার সরকার সর্বদাই কম্পমান থাকে যে তাদের কোন কাজ বা কথাবার্তা দিল্লী সরকারকে বিরক্ত করে কিনা।

অধ্যায় দুই

ভারতীয় ষড়যন্ত্রের সহায়তায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অর্জন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশঃ পরবর্তীতে কী ?

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উৎস

এটা সর্বজনবিদিত যে, বর্ণহিন্দু ও বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের দহরম- মহরমের পক্ষপুটে সৃষ্ট ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এর তিক্ততম বিরোধীতার মধ্যে দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে পাকিস্তান রাষ্ট্রের। এটাও সর্বজনবিদিত যে ভারতীয় কংগ্রেস তাদের নেতা নেহেরুর আপোষহীন মনোভাবের ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করে ফেলে। নেহেরুর যুক্তি ছিল যে যেহেতু এই দুইটি এলাকার মুসলমানরা ভারত বিভাগ রোধ করেনি সেহেতু পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলমান ও হিন্দুদের অধ্যুষিত জায়গা ভাগ হতে হবে -যা ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতি নেহেরুর ঘৃণ্য আক্রোশ। উপরন্তু— ১৯২০ সাল থেকে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি (সিপিআই)ও ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন সৃষ্টির আদলে বহু মতাবলম্বীর জনগোষ্ঠীর দেশ ভারতকেও একদেশ হিসেবে রাখার জন্যে কংগ্রেস- এর দাবীর সমর্থনে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধীতা করতে থাকে; যদিও কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন গণসমর্থন ছিলনা। অবশ্য ১৯৪৭ সালের আগস্টে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় যখন ঘটলো তখন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি তাদের রাজনৈতিক কৌশল পরিবর্তন করলো। কিন্তু তারা অবিভক্ত ভারত পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখেই আভ্যন্তরীন ও সীমান্ত বহির্ভূত কার্যকলাপের দ্বারা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে নির্জীব তথা বিচ্ছিন্ন করা পূর্বক ভারতের সাথে লীন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটা অনেকেরই জানার কথা ১৯৪৭ সালেই শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে কলকাতায় জনাকয়েক কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট নেতার সহযোগে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে পুনএকত্রীকরণের এক উদ্যোগে গ্রহণ করে। এই ব্যাপারে আমি পরে বিশদ আলোকপাত করবো। বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যার্থ হবার পর সেই সময়কার প্রথম কাতারের মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী দেশ বিভাগের পর কলকাতায় থেকে যান। শেখ মুজিব সেই সময় কিছু দিনের জন্য কলকাতায় অবস্থান করেন এবং সেই সাথে আরো ছিলেন আবুল হাশিম, সৈয়দ বদরুদ্দোজা সহ জনাকয়েক মুসলিম নেতা। মুজিব অবশ্য তাড়াতাড়িই ফিরে আসেন কেননা কলকাতায় তার মত তরুণ মুসলমানদের কোন

কিছুই করার ছিলনা। কলকাতায় থাকতে হলে তাকে খাওয়া পরার জন্যে কারো বদান্যতার উপর নির্ভর করতে হতো।

পাকিস্তান শুরুর বছর কয়েক ছিল অত্যন্ত ঝুট- ঝামেলাপূর্ণ এবং প্রশাসন ছিল অত্যন্ত দূর্বল। প্রথমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ মুসলমান উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করতে পাকিস্তানকে হিমসীম খেতে হয়। এমতাবস্থায় ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নানাবিধ অন্তর্ঘাতমূলক পদক্ষেপ- এ উস্কানী ও মদদ দেয়; যার মধ্যে ছিল সেই সময়কার আলোকে কিছু ইস্যুর অবতারণা করা। পাকিস্তান জন্মের মাত্র ১৭ দিন পর ১৯৭১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে তমুদ্দিন মজলিস কর্তৃক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উত্থাপন ছিল তেমনি একটি ইস্যু। প্রাথমিক অবস্থায় নানাবিধ বিপর্যয় সত্ত্বেও পাকিস্তানী জনগণের অদম্য সাহস ও সেই সময়কার ত্যাগ- তীতিক্ষাপূর্ণ নেতৃত্বের কারণে সামগ্রিক বিপর্যয় সামাল দিয়ে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই স্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। ১৯৫৬ সালে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয় এবং পূর্ব বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান- এ নামাংকিত হয়, যা ছিল সংবিধান বর্ণিত ফ্রেমওয়ার্কের এক ইউনিট পদ্ধতির অংশ। অনেক ধরণের সংহতি অর্জন সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান ভারতের দিক থেকে ভৌগলিক অবস্থান হেতু একটা বিপদাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হয়। কারণ তিন দিক দিয়ে বিশাল ভারতীয় ভূভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল পূর্ব পাকিস্তান আর দক্ষিণে ছিল বঙ্গোপসাগর। পূর্ব পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম বাংলার চাইতে ছিল অনেক অনগ্রসর; কেননা প্রায় দুই শতাব্দী ধরে পূর্ব পাকিস্তান ছিল পশ্চিম বাংলার পশ্চাদভূমি। যার দারুণ জনগণ ছিল ব্যাপকভাবে নিরক্ষর এবং দরিদ্র আর এদের ব্যাপক অংশ ছিল ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান। এই অবস্থার তথা অর্থনৈতিক ও বিপদ সংকুল ভূ- প্রকৃতিগত অবস্থার সুযোগ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করার জন্য এক শ্রেণীর বামপন্থী নেতা কংগ্রেসীদের যোগসাজসে উঠে পড়ে লাগে। এই লক্ষ্য অর্জনে মধ্যে একটা যোগ- সাজশ ভারতীয় শাসক চক্র ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্টদের মধ্যে একটা যোগসাজস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বোধ করে।

কম্যুনিষ্ট রাজনীতির জন্যে পূর্ব পাকিস্তানকে উর্বর ভূমি হিসেবে গণ্য করা

পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার অভিযোগ উঠিয়ে কম্যুনিষ্ট ও হতাশ কিছু তরুণ রাজনীতিবীদ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে।

এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পিছনে সাধারণ মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের কোন লক্ষ্য ছিল না কি সে আন্দোলন ছিল বর্ণ হিন্দুদের অবিভক্ত তথা অখন্ড ভারত পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়ন -তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের দাবী রাখে। এই বইয়ের অন্যত্র আমি এটা বিশ্লেষণ করবো। তবে একটা সত্যি যে নিশ্চিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই সত্যটি হচ্ছে ১৯৭১ সালে বিচ্ছিন্ন হবার পর গত ৩৭ বছর প্রায় ৫০০ কোটি ডলার তথা[১]

প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশ লাভ করার পরও সাধারণ মানুষের উন্নয়নে সেই সাহায্য তেমন কোন অবদানই রাখতে পারেনি। কেননা ১৯৯৫ সালের এক উপাত্ত মতে বাংলাদেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ[২] মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে দারিদ্র্যের এই হার ক্রমেই বাড়ছে।

একটি অতি বাম গোষ্ঠী মনে করেছিল যে ইসলামিক পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্ন হলে সহজে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এই বাম গোষ্ঠী এটাও মনে করতো যে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলে সময়ে ভারতের পশ্চিম বাংলা মিলে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

বস্তুতঃ তেমন লক্ষ্য নিয়েই বামপন্থীরা মুজিবের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ১৯৭৫ সালে একদলীয় বাকশালী শাসন কায়েম করেছিল। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে সে লক্ষ্য তারা অর্জন করতে পারেনি; বরং বাকশাল প্রতিষ্ঠার ছয় মাসের মধ্যে মজিব রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয় এবং এর পর বার কয়েক সশস্ত্র বিপ্লব হওয়া সত্ত্বেও কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে তথা ইসলামিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী মুসলিম জাতীয়তাবাদীদেরই বিজয় নিশ্চিত হয় এবং ক্ষণস্থায়ী বাঙালী জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখাত হয়। এটা আজ যে কারুরই গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার ব্যাপার হতে পারে যে কেন পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা তাদের বাঙালি পরিচিতি ও সুদীর্ঘকাল করে লালিত তাদের বাঙালি মূল্যবোধ ১৯৪৭ সালের পর থেকে গত ষাট বছর ধরে বিসর্জন দিয়ে আসছে এবং মার্কসীয় মার্কার সমাজতন্ত্রের আবডালে গত প্রায় চার দশক ধরে নিজেদের কিসমৎ গড়ে চলেছে এমনকি তারা তাদের অঞ্চলকে বিশ্বের বাজার অর্থনীতির সাথেও আজ সম্পৃক্ত করতে চাচ্ছে।

[১] সিরাজুল আলম খান, বাংলাদেশে গণতন্ত্র (এন অল্টারনেটিভ মডেল অব ডেমোক্রাসি ফর বাংলাদেশ) এমএনও পাবলিকেশন্স (প্রাইভেট), ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃ: ৫

[২] ঐ পৃ:- ৬

পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগলিক অসহায়তা

এটা অনেকটাই অনস্বীকার্য সত্যি যে পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে সাতগুণ বড় ভূখন্ডসম্পন্ন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত পাকিস্তানের এই অংশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে রীতিমত যৌক্তিক বলে রাজনীতিবীদদের কেউ কেউ মনে করতো। এদের মধ্যে কিছু প্রামাণ্য তথ্যমতে উল্লেখ্য হচ্ছেন শেখ মজিবুর রহমান; যিনি তার পিতার স্বীকারোক্তি মত ছিলেন একজন গুন্ডা।[৩]

মুজিব ১৯৪৭ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের একজন ছাত্র নেতা ছিলেন। সেই সময় বাংলার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবীদ হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, জনাব শেখ মুজিবকে পৃষ্টপোষকতা প্রদান করেন কোন মহৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়; তাঁর একজন সমর্থক ও তল্পীবাহী হিসেবে মুজিবকে দিয়ে কাজ করানোই ছিল সোহ্রাওয়ার্দী লক্ষ্য। যদিও সোহ্রাওয়ার্দী এবং মুজিব দুইজনই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা রাজনীতির মূলধারা ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনি। স্বভাবতই মুজিব তখনকার বিরোধী রাজনীতিতে তার একটা অবস্থান তৈরী করতে সচেষ্ট হয়। এই লক্ষ্য অর্জনে মুজিব ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার জ্যোতি সেন গুপ্তের সান্নিধ্যে আসেন- যিনি মনোরঞ্জনধর[৪] সহ কতিপয় কংগ্রেস নেতার সাথে মুজিবের পরিচয় করিয়ে দেন। মুজিব তাদের সাথে মিলে পূর্ব পাকিস্তানে কংগ্রেসের লক্ষ্য হাসিলে কাজ করার ব্যাপারে একমত হন। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে মুজিব পাকিস্তানের পুরো সময় ধরে গোপনে কাজ করে আসলেও নির্যাতনের ভয়ে সে বরাবরই ষাট এর দশকের পুরো সময় এমনকি ৬- দফা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়েও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করতে থাকেন। অথচ ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহের পর এই মুজিবই বেশ দম্ভের সাথে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই

[৩] বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ, বি, সরকার সম্প্রতি আমাকে বলেছেন যে, মরহুম শেখ লুৎফুর রহমান নিজকে হতভাগ্য আখ্যায়িত করে ফরিদপুরের প্রকাশ্য জনসভায় এই মর্মে উল্লেখ করেন যে তার দুই পুত্রের মধ্যে ছোটটা (শেখ নাসের) হচ্ছে খোঁড়া আর বড়টা (শেখ মুজিব) হচ্ছে গুন্ডা। উল্লেখ্য যে বিচারপতি সরকার ফরিদপুরে অতিরিক্ত জেলা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে মুজিবের পিতা শেখ লুৎফুর রহমান তার কোর্টে পেশকারের দায়িত্বে ছিলেন।

[৪] জ্যোতি সেন গুপ্ত, হিষ্ট্রী অব ফ্রীডম ম্যুভমেন্ট অব বাংলাদেশ, ১৯৪৭- ৭৩: সাম ইনভলভমেন্ট, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ: ৮৩।

বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেন। এমনকি সর্বশেষ ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ সেনা অভিযানের পূর্বে পাকিস্তানের ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান ও মুসলিম লীগের নেতা খান এ সবুর- এর সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকেও মুজিব বিচ্ছিন্নতাবাদের সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেন। ওয়ালী খানের সাথে ১৯৭১ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মুজিব এই মর্মে ওয়ালী খানকে আস্বস্ত করেছিলেন যে তিনি (মুজিব) যে কোন মূল্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করবেন; কেননা তিনি (মুজিব) নিজকে পাকিস্তান আন্দোলনের একজন অন্যতম সংগঠক বলে দাবী করেন। মুজিব ন্যাপ নেতা ওয়ালী খানকে এই বলে আরো আস্বস্ত করেন যে ওয়ালী খানের পিতা গাফফার খান কংগ্রেসের হয়ে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে কাজ করেছিলেন তখন তিনি (মুজিব) ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নিবেদিত ও ত্যাগী কর্মী। মুসলিম লীগ নেতা সবুর খানকেও মুজিব অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনচিত্তে এই মর্মে আস্বস্ত— করেছিলেন যে কোন মূল্যে তিনি (মুজিব) পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় সর্বাত্মক দায়িত্ব পালন করবেন। জনাব সবুর খান যখন মুজিবকে বলেন যে, আপনি যদি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সত্যি সত্যি প্রত্যাশাও করেন, তা হলেও তা করা উচিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে- কেননা আপনার দল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্য কোনভাবে করতে গেলে ভারত এখানে মজা লুটবে। কিন্তু মুজিব বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা সংক্রান্ত সকল অনুমান, আশংকা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেন ?

নিজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে শেখ মুজিবের স্বীকারোক্তি

১৯৭২ সালের ৭ই জুন অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ছয় মাস পর ঢাকার রমনা রেসকোর্স (সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে) ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব শুরু থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার সাথে তার সম্পৃক্তির কথা দম্ভভরে প্রকাশ করেন এবং কিভাবে তিনি ভারত সরকারের সাথে অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্যের বিষয়াদি আগ থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন তার বর্ণনা দেন।[৫] মুজিব কিন্তু তার সে বক্তব্য কখনও প্রত্যাহার করেনি; যদিও তার রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল একটা লোক- দেখানো বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন ভারত সরকারের সাথে পূর্ব থেকে শেখ মুজিবের যোগাযোগ সংক্রান্ত কথাবার্তা মুজিব সে জনসভায়

[৫] দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, জুন ৮, ১৯৭২

বলেননি। কিন্তু ভারতের গোয়েন্দা জ্যোতি সেন গুপ্তের লেখা ১৯৪৭- ৭৩ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস[৬] বই অথবা মনোজ বসুর লেখার চীন দেখে এলাম ও একই লেখকের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যা ১৯৭২ সালের ১৬ই জানুয়ারি লন্ডনের বাংলার ডাক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল; যা থেকে নঈম হাসানের লেখা বাংলাদেশ ট্রাজেডী[৭] বইতে উদ্ধৃত হয়েছে- তা যদি কেউ পড়েন তা হলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে শুরু থেকেই জ্যোতি বসুর যথাযোগ্য ভূমিকা সমেত মুজিবের সম্পৃক্তির পর্যাপ্ত প্রমাণ লাভ করবেন। মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে শুরু থেকেই তাঁর পিতার সম্পৃক্তির কথা স্বীকার করেছেন। সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দলের সাংসদ আবদুর রাজ্জাক[৮] স্পষ্টতই স্বীকার করেন যে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেন এবং ১৯৬২ সালে ভারতীয় সাহায্য লাভের জন্য গোপনে আগরতলা সফর করেন। কিন্তু ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পরই মুজিবকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে কারাগারে অন্তরীণ করা হয়। এটা কারো কারো মনে থাকার কথা যে ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান- ভারত যুদ্ধের সময় একমাত্র মুজিবই ভারতের বিরুদ্ধে কোন বিবৃতি প্রদান করার দাবী সরাসরি প্রত্যাখান করেন। অনেকেরই এটা বিস্মৃত হবার কথা নয় যে মুজিব বরং সে সময় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন ঘোষণার জন্য গভর্ণর মোনায়েম খানের নিকট দাবী জানান।

আগরতলা ষড়যন্ত্র ছিল একটি সত্যি ঘটনা

কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা- যাকে মুজিব ষাট এর দশকের 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আগরতলা ষড়যন্ত্রের সাথে সেই মুজিব নিজের সম্পৃক্তির কথা সব স্বীকার করে সে মামলার প্রতিপাদ্যকে সত্যি বলে প্রতিভাত করেছিলেন। সে স্বীকারোক্তি ছিল মুজিবের ভন্ডামীপূর্ণ রাজনীতির পরিচায়ক। এ ছাড়াও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবের প্রধান আইনজীবি জনাব আবদুল সালাম খান মামলা প্রত্যাহারের পর ১৯৭১

[৬] জ্যোতি সেন গুপ্ত পূর্বে উল্লেখিত বইয়ের পৃ: ১৯৮

[৭] নঈম হাসান, বাংলাদেশ ট্রাজেডীঃ বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে মুজিবের বাংলাদেশ, লন্ডন, ১৯৭৭, পৃ: ১০

[৮] সাপ্তাহিক মেঘনা ও মাসিক নতুন সফরে প্রকাশিত আবদুর রাজ্জাকের সাক্ষাতকার সেপ্টেম্বর ১৯৫৫, পৃ : ১৫ ও ২২

সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মন্ত্রী প্রফেসার জি. ডব্লিউ চৌধুরীর নিকট বলেছিলেন যে তার (সালাম খান) কোন সন্দেহ নেই যে মুজিব ভারতের যোগসাজশে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র অনেক আগ থেকেই করে আসছিলেন।[৯]

আওয়ামী লীগের এমপি আবদুর রাজ্জাকও স্বীকার করেছেন যে সে (রাজ্জাক) ও শেখ মজিব তাদের দলের প্রাক্তন এমপি চিত্ত রঞ্জন সুতার সহ ১৯৬৯ সালে ভারতে গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে। উল্লেখ্য উক্ত চিত্ত রঞ্জন সুতার ১৯৭৫ সালে মুজিব কর্তৃক একনায়কতান্ত্রিক একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যায়। চিত্ত রঞ্জন সুতার ১৯৭১ সালের ঘটনা প্রবাহের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশকে ভারতের সাথে একীভূত করতে ব্যার্থ হওয়ায় ভারতে বসে হিন্দুদের জন্য পৃথক বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী এই সুতার কেবল ১৯৬৯ সালে লন্ডনে বসে [১০]

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে ভারতীয় মদদই সংগঠন করেনি; সে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর পরই দিল্লীতে তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করে বাংলাদেশকে ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত করার প্রয়োজনীয় সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণেরও আবদার জানান।[১১]

অবশ্য প্রাপ্ত তথ্য মতে, ইন্দিরা তার সে প্রস্তাবে রাজী হননি অন্তত সে সময়ের জন্যে; কেননা সে সময়ের জন্য আন্ত ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতের অনুকূলে ছিলনা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যে ভিত্তিহীন ছিলনা এটা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা'র কর্মকর্তা জ্যোতি সেন গুপ্তের নিজ ভাষ্যতেই স্পষ্ট। তিনি বলেছেনঃ পূর্ব পাকিস্তানে একটা বিদ্রোহ সংগঠনের তৎপরতা দূর থেকে দেখার একজন স্বাক্ষী হিসেবে এটা আমি বলতে চাই যে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা উক্ত বিদ্রোহ সংগঠনের সে সূত্রগুলো বের করতে পারেনি যেগুলো মোটেই মিথ্যা ও জাল ছিলনা।[১২]

[৯] ঐ পৃ: ২২

[১০] ঐ পৃ: ১৫

[১১] ঐ, নভেম্বর, ১৯৯৫ইং পৃ: ২

[১২] জ্যোতি সেন গুপ্ত পূর্বে উল্লেখিত বই, পৃ: ১৯৮

১৯৬৯ সালে গোলটেবিল বৈঠক ব্যার্থ হবার পর সেই সময়কার পাক সেনা প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে মুজিবের দহরম-মহরম জমে উঠে। ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে পাকিস্তানে পুনরায় সামরিক শাসন জারীর ফলে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনপ্রবর্তন রুদ্ধ হয়ে যায় (সরদার এম চৌধুরী রচিত দি আল্টিমেট ক্রাইম : উইটনেস টু পাওয়ার গেম লাহোর ১৯৯৭/১৯৯৯ পৃ: ৯৮ দ্রষ্টব্য)। ইয়াহিয়ার সাথে মুজিবের সুসম্পর্ক ছিল নিতান্তই তাৎপর্যময়; যার ফলে ১৯৭০ এর নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। বস্তুতঃ মুজিব ইয়াহিয়া দহরম-মহরম না থাকলে এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নেতৃত্ব ১৯৫৬ সালের সংবিধানের পুনঃপ্রবর্তন হলে আর ১৯৬৯ সনের সেনা শাসন জারী না হলে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার নোংরা রাজনীতির কোন সুযোগই কারু জন্য ঘটতো না।

ষড়যন্ত্রের সাথে আরো কিছু লোকের যোগসাজস

বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার সাথে আরো কিছু লোকের যোগসাজস ছিল এটা অনেকেই সুবিদিত। এর মধ্যে একজন ছিলেন পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন,[১৩] যার স্ত্রী সম্প্রতি প্রকাশ্যে এক বিবৃতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার সাথে তার স্বামীর পরিপূর্ণভাবে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন।

বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকান্ডের সাথে কর্ণেল ওসমানীর জড়িত থাকার কথাও জানা যায়। কর্ণেল ওসমানী ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি অত্যন্ত নাখোশ; কেননা তার অভিযোগ ছিল কর্ণেল এর উপরে তাকে আর কোন পদোন্নতি দেয়া হয়নি। কিন্তু এই সম্পর্কিত প্রকৃত কাহিনী হচ্ছে ভিন্নতর। এই ওসমানী পেশাগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত অদক্ষ অফিসার। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর যুদ্ধের সময় এই ওসমানীই ছিলেন একমাত্র পাকিস্তানী অফিসার যিনি যুদ্ধের ময়দানে অদক্ষতার কারণে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক বন্দী হন। শুধু তাই নয় বন্দী অবস্থায় তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত অমায়িক ব্যবহারে গলে যান এবং সেই থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার গোপন ভারতীয় কর্মকান্ডে সর্বাত্মক মদদ দান করেন। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস এই ওসমানীকেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর

[১৩] ঐ পৃ: ১৯৫

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ দলিলের একজন স্বাক্ষরদাতা হিসেবে অন্তর্ভূক্তির জন্যে ডাকা হয়নি। শুধু তাই নয়; তার সাথে এমন ব্যবহার করা হয় যে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্যে তাকে অনুমতিও প্রদান করা হয়নি। তাকে ২০০ মাইল দূরে এক নিভৃত স্থানে আটকিয়ে রাখা হয়। একটি সূত্র কর্ণেল ওসমানীর স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করে জানায় যে, ১৯৮৩ সালে লন্ডনে চিকিৎসার জন্যে যাত্রার প্রাক্কালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার তৎপরতার সাথে সক্রিয় থাকার বিষয়টিকে মারাত্মক ভুল ছিল বলে স্বীকার করেন। ততদিনে তার এবং বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট মানুষের পক্ষে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্র করারও কোন সুযোগ অবশিষ্ট ছিলনা।

বাংলাদেশের জন্মের পর এক দশক ধরে তিনি ভারতকে ঘৃণা জানানোর রাজনৈতিক পদক্ষেপ এর সাথে তার সম্পৃক্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

এই ঘৃণার অংশ হিসেবে ওসমানী তার এক পোষা কুকুরের নাম ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নামে রেখেছিলেন। কেননা ইন্দিরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে তার ভারতীয় সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন।

সিরাজুল আলম খান

বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার ইতিহাস অনেকাংশে অপূর্ণ থেকে যাবে যদি ষাট দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান ও তার সহকর্মীদের কার্যকলাপ নিয়ে কিছু আলোকপাত করা না হয়। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমি তার সম্পর্কে একটু উল্লেখ করেছি। এই খান কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কোন খান বংশীয় কেউ নন। তিনি একজন বাঙালি খান, যিনি নোয়াখালীর এক সাদামাটা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এই খানই ছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার প্রধান তাত্ত্বিক। পতিত স্বৈরাচার এরশাদের সময় সংসদের বিরোধী দলের নেতা আ.স.ম আবদুর রবও সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে, তিনি ১৯৬০ সালেই একজন স্কুলের ছাত্র হিসেবে জনাব খানের তত্ত্বমতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।[১৪]

তারা গোপনে ছাত্র সমাজের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ সংগঠিত করে। পরবর্তীতে খানের পরামর্শ ও উপদেশে একাত্তরের বিচ্ছিন্নবাদী যুদ্ধের সময় তাদেরকে দিয়ে বাংলাদেশ লিবারেশান ফোর্স (বিএলএফ) নামে পৃথক একটি

[১৪] মাসিক নতুন সফর, ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৯৫ পৃ: ৮

সশস্ত্র গ্রুপের সৃষ্টি করা হয়। আবদুর রাজ্জাক ছিল বিএলএফ- এর প্রধান। তবে জনাব সিরাজুল আলম খান লম্বা সময় ধরেই ভারতে ভারত সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের পৃষ্টপোষকতায় গোপন তৎপরতায় লিপ্ত থাকে। ১৯৭৫- ৯৫ সনের মধ্যে আমার সাথে বার কয়েক সিরাজুল আলম খানের দেখা ও কথা হয়েছিল। একটি বৈঠকে সিরাজুল আলম খান আমাকে বলেন, 'আমার জীবনের সবচাইতে বড় স্বপ্ন ছিল পাকিস্তান ভাঙা। আমার সে স্বপ্ন পুরণ হয়েছে এবং সে জন্য আমি অনেক খুশী।' কিছুদিন আগে তার একটি নতুন বিবৃতি পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ভারতের পূর্বাঞ্চলসমূহে বাস্তবায়নের দাবী জানান। অর্থাৎ বাংলাদেশ ও ভারতের পূর্বাঞ্চলীর রাজ্যসমূহ মিলে একটা পৃথক স্বাধীন দেশের গোড়াপত্তন করা। বস্তুতঃ এই দাবী তার দেশদ্রোহী তৎপরতার নতুন আর এক অধ্যায়েরই নামান্তর। বেগম জিয়ার বিএনপি সরকার তাকে স্বল্প সময়ের জন্যে কারান্তরালে পাঠিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সে মুক্ত। তার বর্তমান কাজকর্মও অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ।

বয়সে ষাট এর মাঝা- মাঝিতে উপনীত এই সিরাজুল আলম খান দেখতে অত্যন্ত রুগ্ন এবং আসনে- বসনে একজন হিন্দু সাধুর মত। দু'একজন তরুণকে সাথে নিয়ে একটা লাঠির উপর ভর করে তিনি এখানে- সেখানে ঘুরে বেড়ান। আমি তাকে '৯৫ সনে ঢাকা শহরে কোন এক জায়গায় এইভাবে চলাচল করতে দেখি। প্রায়শই সে আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারত সফর করে থাকে। জনাব খানের এক বন্ধু যিনি ৫০ এর দশকের

মাঝামাঝি সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ছিলেন এবং সত্তর দশক থেকে লন্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা; তার থেকে শুনেছি যে একবার সিরাজুল আলম খান তার লন্ডনের বাসায় বেড়াতে গেলে তার সে বন্ধু বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকান্ডের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে সিরাজুল আলম খানকে বাসা থেকে বের করে দেয়।

চিত্ত রঞ্জন সুতার সম্পর্কে আরো কিছু কথা

চিত্ত রঞ্জন সুতার সম্পর্কে কিছু কথা আগে বলেছি। আওয়ামী লীগের নেতা বাকশালের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকের স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য যা প্রথমে ১৯৮৭ সালের সাপ্তাহিক মেঘনায় প্রকাশিত হয়; যা পরে ১৯৯৫ সালের মাসিক নতুন সফরে পুনঃপ্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় যে, নিম্নবর্ণের হিন্দু চিত্ত রঞ্জন সুতার ছিল ভারতের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় মুজিবের কন্টাক্টম্যান।

সুতার বাবু ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকেটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। একই সাথে তার আবাসস্থল ছিল পূর্ব পাকিস্তান ও কলকাতায়। এই সুতার বাবু কলকাতাতেই ১৯৭৫ সন থেকে স্থায়ীভাবে আছেন এবং বাংলাদেশ বিরোধী সর্বধরণের অপতৎপরতার সাথে জড়িত রয়েছেন। বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ে দাবীকৃত তথাকথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলন[১৫] তারই মস্তিস্ক প্রসুত। উল্লেখ্য যে শেখ মুজিবের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে ১৯৭৭ সালের ১৫ই আগস্ট কলকাতায় আয়োজিত এক সভায় এই বঙ্গভূমি আন্দোলনের সূচনা করা হয়। আরো উল্লেখ্য যে, সে সমাবেশে সেই সময় ভারতে স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকা এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যক্ষ পক্ষপুটে অবস্থানকারী মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদও উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের প্রায় সকলেই এই সুতার বাবুর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন যেহেতু তিনি ছিলেন পাকিস্তান আমলে তাদের নেতা মুজিবের সাথে ভারতের সংযোগ রক্ষাকারী ব্যক্তি। বঙ্গভূমি আন্দোলনের সামরিক শাখা বঙ্গসেনার কার্যকলাপও কলকাতা কেন্দ্রিক যদিও এদের কিছু তৎপরতা গোপনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়মিতভাবে চলছে। সুতার বাবু সময়ে কালিনাথ বৈদ্য সহ ইত্যকার অনেক ছদ্মনাম ধারণ করে থাকে। মাঝে মাঝেই তারা বিভিন্ন লিফলেট, পুস্তিকা প্রকাশ করে থাকে। তবে এটা স্পষ্ট নয় যে এদের সাথে পশ্চিম বাংলার সাথে বাংলাদেশকে মিলিয়ে অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার চক্রান্তকারীদের সাথে কোন যোগাযোগ আছে কিনা। তবে সুতার বাবুর সাথে এদের যোগাযোগ থাকুক বা নাই থাকুক বৃহত্তর বাংলা গঠন ও বঙ্গভূমির দাবী একই মুদ্রার এই পিঠ ও ঐ পিঠ বই আর কিছুই নয়। ভারতীয় কংগ্রেস ও শাসক শ্রেণীর জন্য এই সব অপতৎপরতা তাদের দৃষ্টিতে ভারতপন্থীদের রাজনৈতিক অগ্রগতি বলে বিবেচ্য হতে পারে; কিন্তু দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীদের বিবেচনায় এই সব অপতৎপরতা ভূয়া বই আর কিছুই নয়। দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীরা যে কোন মূল্যে সাম্রাজ্যবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের

আগ্রাসন থেকে তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে। এটা নিশ্চিত দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীদের কারুরই এই সুতার বৈদ্যনাথ বাবুদের ভারতপন্থী বঙ্গভূমি আন্দোলন কিংবা বৃহত্তর অথবা যুক্তবাংলা গঠণের অপতৎপরতাকারীদের প্রতি বিন্দুমাত্র সমর্থনও নেই।

[১৫] এম, টি, হোসেন 'বঙ্গভূমি' দি উইকলী ফ্রাইডে, লন্ডন, সেপ্টেম্বর ১, ১৯৮৯ইং

আ স ম রব

এটা অনেকেই জানেন যে জনাব সিরাজুল আলম খানের অন্যতম তল্পীবাহী আ স ম রব ছিলেন পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় মুজিব-ইয়াহিয়ার মধ্যকার সম্ভাব্য ন্যুনতম সমঝোতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে ব্যার্থ করার অন্যতম রূপকার; যে আওয়ামী লীগকে দিয়ে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সর্বাত্মক কৌশল নির্ণয় ও তা বাস্তবায়ন করেন। বিশ্বস্ত সূত্রে মতে, ১৯৭১ সালের ২০ শে মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া সমঝোতা প্রায় নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে তার ছাত্র ও যুব নেতারা মুজিবের প্রতি রুষ্ট হয়ে তার থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলে মুজিব অনেকটা অসহায় হয়ে পড়েন। কারণ এদের সমর্থন ছাড়া তার রাজনীতিতে টিকে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল বিধায় তিনি তাদের কথামত চলার নীতি অবলম্বন করে ইয়াহিয়ার সাথে সমঝোতার পথ থেকে দূরে সরে গেলেন। এক পর্যায়ে তিনি সমঝোতার ব্যাপারে অনেকটাই চুপচাপ হয়ে গেলেন। এমনিতর পর্যায়ে ২৩শে মার্চ তিনি বাংলাদেশের পতাকা (প্রস্তাবিত) তার গাড়ীতে লাগিয়ে প্রেসিডেন্ট হাউসে গেলেন- যা ছিল পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির প্রতি এক চপেটাঘাত।[১৬]

আর ২৩শে মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। যাই হোক, মুজিবের ইতিমধ্যকার চুপচাপ অবস্থা ছিল সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এক বিশ্লেষণ মতে মুজিব কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, না অন্য কোন মতলবে চুপচাপ ছিলেন তা বোধগম্য করা দুস্কর। তবে একটা বিশ্লেষণ মোটামোটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা হয়। সম্ভবত মুজিব ঐ সময়টার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ নাকি পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি- এই প্রশ্নে তার ভূমিকা নির্ধারণে দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিমজ্জিত ছিলেন। এক বিশ্লেষণ মতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সামনে মুজিব ছিলেন অসহায় যার দরুণ ২৫-২৬ শে মার্চ রাতে তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই পাকিস্তানের ফেডারেল আর্মির নিকট আত্ম সমর্পণ করেন; যাতে করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ দমন করতে পারে। আর একটি বিশ্লেষণ মতে মুজিব চেয়েছিলেন উভয় রাস্তাই খোলা রাখতে এবং অবশেষে তাদের সাথেই থাকতে যারা সংঘাতে জয়ী হবে। তেমনি করে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানের পতন হবার পর মুজিব পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথেই হাত মিলান। ১৯৭১

[১৬] হাসান জহীর, দি সেপারেশান অব ইষ্ট পাকিস্তান, অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস, করাচী, ১৯৯৪, এবং ষ্ট্যানলী ওলপার্ট, জুলফী ভুট্রো অব পাকিস্তান; হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস, দিল্লী, ১৯৯৩

সালের মার্চ মাসে ইয়াহিয়ার সাথে আলাপ আলোচনা চালানোর পিছনে মুজিবের মনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক, এক পর্যায়ে তথা ২০শে মার্চের পর তাঁর চুপচাপ অবস্থা দৃশ্যপটে আনয়ন করে জনাব তাজউদ্দিনকে। অথবা বলা যায় মুজিবের চুপচাপ বা সিদ্ধান্তহীন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে জনাব তাজউদ্দিন। জনাব তাজউদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ধূর্ত চরিত্রের মানুষ এবং ছিলেন মুজিবের চাইতে অনেক বেশী চালাক। সম্ভবত মুজিব সে বিবেচনাতেই পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার বাকী কাজগুলো সম্পন্ন করার দায়িত্ব তাকে প্রদান করেন। এটার প্রমাণ হচ্ছে মুজিব ২৫- ২৬ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করলেও তাজউদ্দিন পালিয়ে যায় ভারতে এবং তার প্রধানমন্ত্রীত্বে সেখানে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে গঠিত হয় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার। বস্তুতঃ স্বাধীনতা সরাসরি ঘোষণা করার ক্ষেত্রে মুজিব ও তাজউদ্দিনের দ্বিধা- সংশয় পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার চিন্তা থেকে ছিল না; বরং সে দ্বিধা ছিল নিজেদের জীবন রক্ষা করার চিন্তা থেকে। কেননা, স্বাধীনতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা প্রতিহত করতে সেনা অভিযানে তাদের জীবনহানী ঘটতো।[১৭]

জনগণ বিচ্ছিন্নতাবাদ চায়নি

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিলনা; তারা পাকিস্তানকে ভাঙ্গবার জন্যে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। এটা তাজউদ্দিন এবং মুজিব জানতো বিধায় তারা কখনও রাজনৈতিক বাগাড়াম্বরীতা দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতার কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করেনি; কেননা তারা এটা ভালভাবেই অনুমান করেছিল যে জনগণ তাদের মূল লক্ষ্যের কথা জানতে পারলে তারা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতো। অথচ তারা ছিল মনেপ্রাণে বিচ্ছিন্নতাবাদী। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে তাজউদ্দিনের একজন প্রতিনিধি ১৯৭১ সালে লন্ডনে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার একটি সম্ভাবনাময় সমঝোতার প্রয়াসকে ভন্ডুল করে দেয়। প্রসঙ্গত পাকিস্তানের সেই সময়কার নামজাদা সাংবাদিক ও এক সময়ের কুটনৈতিক কতুবুদ্দিন আজিজের একটি লেখা প্রণিধানযোগ্য। জনাব আজিজ ওয়াশিংটন কেন্দ্রিক একাত্তরের কুটনৈতিক তৎপরতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। নিক্সন প্রশাসন কর্তৃক সেই সময় গৃহীত একটি কুটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান বর্ণনা করতে গিয়ে

[১৭] মাসিক নতুন সফর, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫- ১৯৮৭ সালে সাপ্তাহিক মেঘনায় প্রকাশিত আবদুর রাজ্জাকের সাক্ষাতকার থেকে উদ্ধৃত।

জনাব আজিজ লিখেনঃ সেই সময় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফরের সময় প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাকে (ইন্দিরা) বলেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের সংঘাত- এর একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে তার কিছুটা সময় দরকার এবং ইন্দিরাকে তিনি উপমহাদেশে নতুন করে যেন কোন যুদ্ধের সূত্রপাত না করা হয় তার জন্যে অনুরোধ করেন। জনাব আজিজের লেখায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, নভেম্বরের ৫ তারিখে (১৯৭১ সাল) ওয়াশিংটন ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক মধ্যহ্ন ভোজ সভায় প্রদত্ত ভাষণে ইন্দিরা গান্ধী (আমি সেই সময় ইন্দিরা ও হেনরী কিসিঞ্জার উভয়ের সাথেই সাক্ষাত করি) অত্যন্ত অতি ধীর ও শান্ত কণ্ঠে তার শঠতাপূর্ণ বক্তব্যে জানান যে, 'পাকিস্তানের কোন এলাকা অথবা পূর্ব বাংলার সাথে ভারতের কোনই বিরোধীতা বা ঝগড়া নেই'। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের লেখা বই মেমোয়েরস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আজিজ লিখেছেনঃ প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ইন্দিরা বস্তুতঃ বোকা বানিয়ে রেখেছিল এমন একটি ধারণা দিয়ে যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সে কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেনা। ইন্দিরা যখন নিজে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং সে কাজে তার জেনারেলরা দিল্লীতে বসে সোভিয়েত ইউনিয়নের চার জেনারেলের সহায়তায় সমরনীতি চূড়ান্ত করছিলেন; সে সময় নিক্সনকে তিনি (ইন্দিরা) এটা ঝুঝাতে সক্ষম হন যে, পাকিস্তানের ঐক্য ও অস্তিত্ব ধ্বংসে তাঁর (ইন্দিরা) কোন ইচ্ছাই নেই।[১৮]

আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত একটি সূত্রে জানি যে, ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে লন্ডনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মেয়ে বেগম আখতার সোলায়মানের মধ্যস্থতায় পূর্ব পাকিস্তান সংকটে জড়িত বিদ্যমান পক্ষ সমূহের মধ্য একটা সমঝোতার প্রয়াস নেয়া হয়। সে সমঝোতা বৈঠকে অংশগ্রহণকারী একজন ছিলেন আমার এক বন্ধু। উক্ত বৈঠকের আলোচনার বিষয়াদি শুনে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে তাজ উদ্দিন ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ সমর্থনে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা ঠেকাতে ইসলামাবাদের সাথে সকল ধরণের সমঝোতার কঠোর বিরোধী ছিলেন। তাজউদ্দিনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং কলকাতায় তার সন্নিধ্যে থাকা আওয়ামী লীগের প্রাক্তন এমপি জনাব এম এ মোহাইমেন তার এক বইতে এই মর্মে তাঁরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে লিখেছেন যে, 'ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কাঠামোয় কোন ধরণের সমঝোতা হবার প্রয়াস- এর মারাত্মক

[১৮] কুতুবুদ্দীন আজিজ, এক্সসাইটিং ষ্টোরিজ টু রিমেম্বার, দি ইসলামিক মিডিয়া কর্পোরেশন, করাচী ১৯৯৫

বিরোধী ছিল ভারত এবং এই জন্যে তারা প্রবাসী সরকারকে নানারূপ হুমকিও প্রদান করে'।[১৯]

মুজিবের বিচ্ছিন্নতাবাদী ভূমিকা সম্পর্কে নতুন করে তথ্য প্রমাণের তেমন দরকার নেই। মুজিব বিচ্ছিন্নতাবাদী না হলে ১০ই ডিসেম্বর পর সে দেশে ফিরে এসে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় দখলদারিত্বের বিরোধীতা করে তার বন্ধু এ কে ব্রোহীর নিকট তার বর্ণিত পাকিস্তান রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। কেননা মুজিব ব্রোহীকে বলেছেন যে, তিনি পাকিস্তান ভাঙ্গতে চাননি। ব্রোহী আরো জানান যে, ১৯৭১ সালের শেষে দিকে ভারত যখন পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে তখন নাকি মুজিব তাঁকে পাকিস্তান টেলিভিশনে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিরোধের আহবান জানানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। তার এই অভিপ্রায়ের কথা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসনিক জেনারেল ইয়াহিয়ার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল।

কিন্তু মুজিবের সে অভিপ্রায়কে কোন গুরুত্ব প্রদান করেনি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ (ইমপেক্ট ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ২৮ সেপ্টেম্বর- ৮ অক্টোবর ১৯৮৭ সংখ্যা পৃষ্টা ১৯ দ্রষ্টব্য)। ১৯৭১ সনের পূর্বে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে মুজিব সব ধরণের অভিযোগ অস্বীকার করলেও বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার সাথে তার সম্পৃক্তির বহু প্রমান রয়েছে। জনাব মুজিবের সমসাময়িক রাজনীতিক জনাব অলি আহাদ- তার জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫- ৭৫ বইতে লিখেছেন মুজিবের নিকট ক্ষমতা তথা নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল মুখ্য; এবং এই লক্ষ্য হাসিলে যত ধরণের ফন্দি- ফিকির করা যায়; যত মূল্যই তার জন্য যোগান দেয়া দরকার মুজিব তার সবকিছু করতেই অভ্যস্থ ছিল। ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্যে মুজিবের সর্বধরণের সুযোগ সন্ধানী পদক্ষেপের প্রেক্ষিতেই ভারত মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহস্র বছরের প্রতিশোধ গ্রহণ করে; আর এই সুবাদে মুজিব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারগারে তার ব্যয়বহুল এরিনমোর তামাকের পাইপ মুখে দিয়ে রাজসিকভাবে জীবন যাপন করেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ জয়ের পর মুজিবকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তানের রাজমুকুট পরানো হলেও একটি স্বাধীন দেশের নেতা হিসেবে তিনি ভারতকে মোকাবেলা করার সৎসাহস বা নৈতিক শক্তি দেখাতে পারেনি ; বরং ভারতের একজন পুতুল হিসেবেই নিজকে প্রমাণ করেন। মুজিবের সে নৈতিক বল না থাকার কারণ হচ্ছে

[১৯] এম,এ, মোহাইমেন, ঢাকা- আগরতলা- মুজিবনগর, পাইওনিয়ার পাবলিকেশানস, ঢাকা, ১৯৮৯

তার বিচ্ছিন্নতাবাদী ভূমিকা। আর তিনি জানতেন যে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে পিছনে জনসমর্থনের যে শক্তি থাকতে হয় তা তার নেই। কেননা জনগণ তাকে ১৯৭০ এর নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল আর যাই হোক অন্তত দেশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য নয়।

ভারতকে পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পুতুল হিসেবে দায়িত্ব পালন

উপরেউল্লেখিত ঘটনা প্রবাহ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে মুজিব ও তার সকল সাঙ্গাত পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভারতের নোংরা কৌশলের খেলায় পুতুল হিসেবে কাজ করেছে। এই নোংরা কৌশলের চূড়ান্ত হিসাব- কিতাবে কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের কোন আগ্রহ নেই ; বরং তাদের অখন্ড ভারতের লালিত স্বপ্নের সন্নিবেশন রয়েছে, যা মুসলমানদের নিগ্রহের মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব বলে তারা মনে করে। এ কারণেই ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বাংলাদেশকে প্রথমে ২৫ বছর মেয়াদী এক দাসত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ করা এবং পরবর্তীতে ফারাক্কা সহ বাংলাদেশের প্রায় সকল নদীর উজানে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ- গ্রোয়েন নির্মাণ করে বাংলাদেশের জীবন ব্যবস্থাকে নানাবিধভাবে বিপদাপন্ন করে রাখা হয়। ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে পুরো বাংলাদেশকে বৃহত্তর ভারতের অঙ্গীভূত করা। এটাই ছিল ৪৭ পূর্ব সময়ে ভারতীয় রাজনীতিবীদদের ইচ্ছা-যা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের আশা-আকাংখার বিরোধী। অবস্থা দৃষ্টে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বস্তুত বাংলাদেশ হচ্ছে ভারতীয়করণের ট্রানজিট পর্যায়। ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা ও লেখক বলরাজ মাধক প্রদত্ত ভারতীয়করণের সংজ্ঞা সম্পর্কে অনেকে হয়তো অবহিত। বলরাজ বলেছেন, ভারতীয়করণ হচ্ছে ভারতের সকল ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল ও মতবাদ নির্বিশেষে যে কারুরই অখন্ড ভারত বিরোধীতা কিংবা ভারতের সীমান্ত বহির্ভূত যে কোন ধরণের আনুগত্যকে তথা দ্বিজাতিতত্ত্বের সকল সূত্রকে ধ্বংস করে দেয়া।[২০]

এই সংজ্ঞাই সকল ভারতীয়ের জন্য সার্বজনীন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এমনিতর সংজ্ঞায় বিশ্বাসী ভারত কোন বিবেচনায় ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করলো- যে বিচ্ছিন্নতাবাদের ভিত্তি ছিল আঞ্চলিকতাবাদ

[২০] বলরাজ মোধক, ইন্ডিয়ানাইজেশান, এস, চান্দ এন্ড কোঃ (প্রাইভেট) লিমিটেড, দিল্লী, ১৯৭০, পৃ: ১০২

ও ভাষা ? কেননা তারা কি এটা ভাবেনি যে এই ভিত্তি কোন এক সময় ভারতের ঐক্যকেও বিনষ্ট করতে পারে ? এমন ধরণের বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন ১৯৭১ সালে ইন্দিরা সরকার যে করেনি তা নয়; তারা তা করেও বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করেছে এই বিবেচনায় যে বাংলাদেশ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সময়ে দূর্বলরূপ পরিগ্রহ করবে এবং তা থেকে বাঁচার জন্যে বাংলাদেশ এক সময় ভারতীয় ইউনিয়নে প্রত্যবর্তন করবে। ১৯৪৭ সালে এমন ভবিষ্যতবাণীই করেছিল প্যাটেল, নেহেরু, শ্যামা প্রসাদ সহ ভারতীয় নেতারা। ভারতের সর্বশেষ বৃটিশ বড়লাট মাউন্টবেটেনের ব্যক্তিগত সচিব হডসন লিখেছেন, দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যার দরুণ কয় বছরের মধ্যেই পূর্ব বাংলা ভারত এর সাথে মিশে যাবে।[২১]

জাওয়াহারলাল নেহেরু ১৯৪৭ সালের ২৩ শে মে তার কংগ্রেসী সহকর্মী কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীকে লেখা একটি পত্রে অনুরূপ আশাবাদই ব্যক্ত করেন। এ সময় ভারতের ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী বলেন 'আমরা অনেকটা জবরদস্তিকমূলকভাবে বাংলা বিভাগ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এটা সাময়িক; আমরা অবশ্য অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠা জন্য কাজ করে যাবো'।[২২]

অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভারতীয় ষড়যন্ত্রকারীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয় যে ষড়যন্ত্রকারীরা ১৯৪৭- এর পর থেকেই পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত লিপ্ত ছিল।

বিচ্ছিন্নতাবাদ ও শেখ মুজিবের ৬- দফা স্বায়ত্বশাসনের দাবী

শেখ মুজিবের স্বায়ত্বশাসনের ৬- দফা দাবীর স্থপতি কে- - আওয়ামী লীগে এ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের কোটায় এক সময়ের পাকিস্তান

[২১] এইচ, বি, হর্ডসন, দি গ্রেট ডিভাইডঃ বৃটেন- ইন্ডিয়া- পাকিস্তান, হাচসিনসন, লন্ডন, ১৯৬৯ পৃ: ২৭৬

[২২] মতিউর রহমান, বাংলাদেশ টুডে, এন ইনডিক্টমেন্ট এন্ড ও লেমেন্ট, নিউজ এন্ড মিডিয়া লিঃ লন্ডন, ১৯৭৮ পৃ: ১৫৩

বৈদেশিক সার্ভিস (পিএফএস) এর কর্মকর্তা জনাব রুহুল কুদ্দুস নিজেকে ৬- দফা দাবীর ব মূল প্রণেতা হিসেবে দাবী করেন। [২৩]

তবে তিনি এই মর্মে দুঃখ প্রকাশ করেন যে মুজিব তাঁর জীবদ্দশায় কখনও তার (রুহুল কুদ্দুস) এতদসম্পর্কিত ভূমিকা স্বীকার করেনি; বরং ৬- দফার একচ্ছত্র পরিকল্পক ও রূপকার হিসেবে সে (মুজিব) নিজকেই কেবল জাহির করেছে। স্বায়ত্বশাসনের ৬- দফা কর্মসূচীর স্থপতি যেই হোক না কেন- এটা সত্যি যে ৬- দফা আন্দোলনই পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার বীজ রোপন করে। এটা করা হয় খুব ধূর্ততার সাথে; কেননা জনগণ উক্ত কর্মসূচীর নিগলিতার্থ বুঝতে পারলে কিছুতেই চূড়ান্ত অর্থে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জালে তারা নিজেদের জড়াতোনা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও এটা কোন ইস্যু ছিলনা। উপরন্তু মজিব বরাবরই বলতেন যে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোন উদ্যোগ তিনি সমর্থন করেননা; বরং তিনি শক্তিশালী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী এবং এই লক্ষ্যেই তিনি কাজ করে যাবেন। পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার এই ওয়াদা ছিল মুজিবের প্রকাশ্যে, একান্তে, তার সাথে সাক্ষাতকারী এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক নেতার নিকট। আমি জানি যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতা খান, এ, সবুর ও পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপ নেতা ওয়ালী খানকেও তাঁর (মুজিব) প্রদত্ত এই ওয়াদার কথা[২৪] পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে এটা উল্লেখ না করা অসমীচিন হবে যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার ক্রীড়নকরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী অসাবধানতার সাথে মোকাবেলা করার সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে জন্ম নেয়া উর্দ্দুভাষী রাজনৈতিক নেতা খাজা নাজিম উদ্দীনের কিছু বেকুবী ও উস্কানীমূলক কথাবার্তা

[২৩] মাসুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ'র ভূমিকা ওসমানী লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৯০, পৃ: ১৬৯

[২৪] ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় মুসলিম লীগ নেতা খান, এ, সবুর ও পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপ নেতা ওয়ালী খানের সাথে অনুষ্ঠিত একান্ত আলাপচারীতায় শেখ মুজিব যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ওয়াদা করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনকারী একজনকে এই মর্মে একনিষ্টভাবে বলেছিলেন যে তিনি যেন শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাত করে তার উক্ত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং মুজিবকে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে বলেন যে, চল্লিশের দশকে ওয়ালী খানের পিতা যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করেছিলেন তখন মুজিব তার পিতাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ভাষায় কঠোর সমালোচনা করে যার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে মুজিব ছিল একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক পাকিস্তানী।

সে অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রদত্ত বক্তৃতার পর যেখানে প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল; তাকে নতুনভাবে উঠানোর সুযোগ পেল পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫২ সালের শুরুতে ঢাকায় খাজা নাজিম উদ্দিন আহমেদ যখন উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা পুনরায় উল্লেখ করেন। অথচ ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলার প্রচলন পূর্ণভাবে চলছিলো যদিও তখনকার ঢাকা ও কলকাতার মুখচেনা কয়টি পত্রিকা বাংলা ভাষার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবার কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। বাংলা ভাষার ইস্যুটিকে ঠিকভাবে মোকাবেলা না করতে পারার ব্যার্থতা থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পুরোপুরি ফায়দা উঠায়। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী সংগঠিত ঘটনা প্রবাহের মধ্যে যারা পুলিশের গুলিতে মারা যায়; প্রকৃত অর্থে ভাষা আন্দোলনের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পৃক্তি আদৌ ছিল কিনা এটা বলা দুষ্কর। কিন্তু নিহতদের ভাষা আন্দোলনের শহীদ হিসেবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ক্রীড়নক ধূর্ত নেতারা জোর প্রচারনা চালায়। একই কায়দায় ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের অবিচক্ষণ সেনা অভিযানের পরও নানারূপ উস্কানীমূলক প্রচারণা চালিয়ে জাতিকে বিভান্ত ও ক্ষুদ্ধ করে তোলে।

সত্যি বটে যে, ২৫ মার্চের সেনা অভিযানের প্রেক্ষিতে অনেক দিকেই পরিস্থিতির অবণতি ঘটেছিল; কিন্তু যে প্রশ্নের আজও কোন সুরাহা হয়নি তা হচ্ছে সেই সেনা অভিযান কি খুব সুচিন্তিত ছিল, নাকি ছিল বিদ্রোহ প্রশমিত করার লক্ষ্যবোধে, নাকি সে সেনা অভিযান ঘটেছিল অনেকটা বাধ্যবাধকতামূলক পরিস্থিতিতে- যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে পাকিস্তানের ফেডারেল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড তথা দেশ ও জনগণের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত আগ্রাসন থেকে। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে সেনা অভিযান ছিল বিরাট ভুল; তাহলেও এটা কি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য যে জনগণ পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্যে কাকেও কোন ম্যান্ডেট দিয়েছিল ? কারণ এটা অনেকেরই জানার কথা যে, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে এই প্রদেশের অধিবাসীরাই তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে অনেক বেশি নিরঙ্কুশ সমর্থন ও রায় প্রদান করেছিল। এমনকি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে উপমহাদেশের মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে একটি সমঝোতায় উপনীত হবার জন্যে ইজমা করা সহ যা কিছুই করেছে তা কারো নিকট তেমন কোন আবেদন সৃষ্টি না করলেও ১৯৭১ সালের বিয়োগান্তক ঘটনার মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রতিষ্ঠার যে অর্জন

তাকে আইনানুগ ভিত্তি দেবার জন্যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদের উপর একটি গণভোট অনুষ্ঠান করা জরুরি বলে অনেকে মনে করেন। সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশ একটি ডিফ্যেক্টো সত্ত্বা; কিন্তু ১৯৪৬ সালের গণভোটের ফলাফলকে পুরো উল্টে ফেলার জন্য দেশটির আইনানুগ অবস্থান[২৫] একটি উদ্বেগের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে যদিও পাকিস্তান ১৯৭৪ সালে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভারতের শাসক গোষ্ঠীর আদর্শিক ও মানসিক অবস্থান সম্পর্কে যারা সুবিদিত তারা এটা নিশ্চয় জানেন যে, বাংলাদেশ- এর অভ্যুদয়ে কেবল ভারত তৃপ্ত থাকতে পারেনা। ভারতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে হজম করা পূর্বক লেন্দুপ দর্জি মার্কা কাকেও দিয়ে সিকিমের মত বাংলাদেশকে গ্রাস করতে। সময়ই বলতে পারে যে ভারত তার উদ্দেশ্য সাধনে লেন্দুপ দর্জি র্মাকা কাকেও শেষাবধি পাবে কিনা।

[২৫] এই, বি, খায়ের বাংলাদেশঃ দি কোশেচন অব লেজিটেমেসী ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ভল্যুয়ম ১৮, জানুয়ারী ৮- ২১, ১৯৮৮, পৃ: ১২ এবং এইচ, বি, খায়ের, বাংলাদেশ এ সোর কোশ্চেন, দি কনসেপ্ট, ইসলামবাদ ভলিয়্যুম ৮, নং ২, ফেয়ালী ১৯৮৮ পৃ: ২১- ২২, উদ্ধৃত ২টা নিবন্ধেই লেখক গ্রহণযোগ্যভাবে এই মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে বস্তুতঃ মুসলিম জাতিত্বের ধারণার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

অধ্যায় তিন

১৯৭১ সালের পর থেকে একাত্তরের হত্যাকান্ডের একপেশে কল্পকাহিনী ও মিথ্যাচার

মিথ্যাচারের পুনরাবৃত্তি

এটা আজ কারো অবিদিত নয় যে সব মিথ্যাচারের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে একাত্তরে অভ্যুদয় ঘটানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশ- এর সে মিথ্যাচারেরই অব্যাহত পুনরাবৃত্তি করে আসা হচ্ছে গত কয়েক দশক ধরে। এমনিতর মিথ্যাচারের একটি অংশ হচ্ছে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত '৩০ লক্ষ' মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আরো কৌতুহলউদ্দীপক হচ্ছে পাক বাহিনী কর্তৃক উক্ত সময়ে দুই লক্ষ মহিলার শ্লীলতাহানীর কল্পকাহিনী।

প্রাসঙ্গিকভাবেই কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হয়। কারা ঐ দুইটি পরিসংখ্যান নির্ণয় করেছে ? কৌতুলহলউদ্দীপকভাবে এই প্রশ্ন যে কারুরই মনে উদয় হবার কথা যে কিভাবে ঐ দুইটি সংখ্যাতত্ত্ব একেবারে লক্ষের পূর্ণ সংখ্যায় তথা ৩০ লক্ষ ও দুই লক্ষে নির্ণীত হলো ? নয় মাসের মধ্যে কিভাবে ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা ও দুই লক্ষ মহিলার শ্লীলতাহানী করা হলো ?

বিশ্বাসযোগ্য কোন সংখ্যা আজো নির্ণীত হয়নি

এ পর্যন্ত জানা মতে কেহই ঐ দুইটি সংখ্যাতথ্যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে নির্ণয় করতে পারেনি। এমনকি ঐ দুইটি সংখ্যাতথ্যের অনুকূলে কোন সংস্থা আজ অবধি একটি নমুনা জরীপও সম্পন্ন করেনি। যেখানে কোন সরকারি সংস্থা কিংবা স্থানীয় বিদেশী কোন সংস্থা আজ অবধি এই সংখ্যাতথ্যের উপর প্রামাণ্য কোন জরীপ সম্পন্ন করতে পারেনি; সেখানে কিসের ভিত্তিতে ঐ দুইটি সংখ্যাতথ্য নিয়ে প্রচারণা চালিয়ে আসা হচ্ছে ?

কোন প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই

বর্ণিত সংখ্যাতথ্য দুটির ভিত্তি কি ? যদি কোন বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে থাকে সেগুলো কি কি ? যতদূর জানা যায়, যেহেতু উক্ত সংখ্যাতথ্য দুটো শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন সে জন্যই তা অতি পবিত্র (!) ও অকাট্য বলে ধরে নেয়া হয়। এই সংখ্যাতথ্য দুটির সত্যাসত্য বিশ্লেষণ করাও যেন কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন যে কারুরই

জন্য নিষিদ্ধ, এমনকি বর্ণিত সংখ্যাতথ্য দুটির বৈধতা নিয়েও যেন কারো কোন প্রশ্ন উত্থাপন নিষিদ্ধ, এমনকি কখন কি ধরণের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব ঐ সংখ্যাতথ্য দুটি জাহির করেছেন তার কোন বস্তুনিষ্ট মূল্যায়ন করাও যেন যে কারুরই জন্য নিষিদ্ধ! কেন মুজিব ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরার আগেই ঐ সংখ্যাতথ্য দুটি সাধারণ্যে জারী করলেন ?

এটা সবারই জানা যে ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের নয় মাস পর্যন্ত মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী জেল এ অন্তরীন ছিলেন। অন্তরীন সময়কালে সংবাদ মাধ্যমের সাথে তার কোন যোগাযোগ ছিলনা। ফলে সেই সময়ের মধ্যে কোথায় কি ঘটেছে তা তার জানা ছিলনা। ২০ শে ডিসেম্বর ভুট্রো প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর মুজিবকে ইসলামাবাদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাকে আরো ১০/১২ দিন অন্তরীন রাখা হয়। ঐ সময়ের মধ্যেও কোন সূত্র বা মহলের সাথে মুজিবের কোন যোগাযোগ হয়নি। বার কয়েক ভুট্রো সাহেবের সাথে কথাবার্তা হয়েছে কিভাবে বাংলাদেশ নামে ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে পাকিস্তানকে পুনঃএকত্রীকরণ করা যায়; সেই সমঝোতা নিরূপণ ও প্রতিষ্ঠার জন্যে।[১]

সম্ভবত মুজিবের সাথে আলোচনায় সন্তুষ্টি লাভ করার পরই ভুট্রো পিআই- এর একটি বিশেষ বিমানে ১৯৭২ সনের ৮ই জানুয়ারি মুজিবকে লন্ডন প্রেরণ করেন। লন্ডনে ক্লারিজেস হোটেলে রাত কাটিয়ে পর দিন ৯ই জানুয়ারি তিনি দিল্লীতে পৌঁছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলাপ আলোচনা করে ১০ই জানুয়ারি অপরাহ্নে ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে আগমণ করেন। লন্ডনের একটি সূত্রমতে মুজিব লন্ডন থেকে মস্কোর সাথে যোগাযোগ করেন। এটা হয়তো ঠিক যে মস্কো অথবা দিল্লী অথবা উভয়ে মুজিবের কানে ঐ দুটি সংখ্যাতথ্য ঢুকিয়ে থাকবে। কেননা ঐ দুটি দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য তেমন আজগুবি সংখ্যাতথ্য তারা মুজিবের কানে ঢুকিয়ে দেয়। একটি সূত্রের মতে এই সংখ্যাতথ্যের মিথ্যাচারটি মস্কোই প্রনয়ণ করেছে; অন্য একটি সূত্রের মতে ব্যাপারটা দিল্লীর তৈরী। উল্লেখ্য যে দিল্লী এবং মস্কো উভয়েই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে তাদের কথিত যথাথর্, যৌক্তিক ও নৈতিক আগ্রাসন চালায়।

---

[১] ষ্ট্যানলী ওলপার্ট, জুলফী ভূট্রো অব পাকিস্তানঃ হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, দিল্লী,ইটিসি ১৯৯৩

৩০ লক্ষ সংখ্যাতথ্যের অসারতা সম্পর্কে জহুরী

সাংবাদিক জহুরী তার লিখিত 'ত্রিশ লাখের তেলেসমাতি' বইয়ে ৩০ লক্ষ নিহত হবার বিষয়টিকে তদানীন্তন ঢাকার বাংলা দৈনিক পূর্বদেশ এর সম্পাদক জনাব এহেতেশাম হায়দার চৌধুরীর একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উদ্ভাবন আখ্যায়িত করে তার বইয়ে এতদসম্পর্কিত প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করেন। জহুরী প্রদত্ত প্রমাণ মোতাবেক জনাব এহেতেশাম হায়দার চৌধুরী কাল্পনিক এই সংখ্যাতথ্যটি উদ্ভাবন করেন সেই সময় ঢাকায় কর্মরত মস্কো দূতাবাসের এক কনস্যুলারের যোগসাজশে।[২] জনাব জহুরী প্রসঙ্গক্রমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা পতনের ৬ দিন পর পূর্বদেশ- এ প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়- এর উদ্ধৃতি প্রদান করেন।[৩]

উল্লেখ্য যে পূর্বদেশ ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে সংঘাতের নয় মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অতি উচ্ছ্বাসী সমর্থন ছিল; কেননা পত্রিকাটির মালিক ছিলেন নোয়াখালী জেলার অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালি জনাব হামিদুল হক চৌধুরী। বস্তুতঃ পত্রিকাটি উক্ত সম্পাদকীয়তে লক্ষ লক্ষ নিহত হবার গপ্প প্রকাশ করে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় পত্রিকার নয় মাসব্যাপী ভূমিকাকে পাঠকদের মন থেকে বিস্মৃত করার চেষ্টা করেন। পূর্বদেশ এর উক্ত সম্পাদকীয়তে বর্ণিত সংখ্যাতথ্যটিকে প্রকৃত ও প্রধানতম উৎস অভিহিত করে মস্কোর কম্যুনিষ্ট সরকারের সংবাদ মাধ্যম সমূহ তা প্রচার করে এবং পরবর্তীতে ঢাকার ও ভারতের অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমেও সেই সম্পাদকীয়তে বর্ণিত ৩০ লক্ষ নিহত হবার গাল গল্পের প্রচারণা ১৯৭২ সালের ৫ই জানুয়ারির পর থেকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে আসছে।[৪]

কোন কোন সূত্র মতে দিল্লী লন্ডন হয়ে ১০ই জানুয়ারি ঢাকা প্রত্যাবর্তনের সময় উক্ত কাল্পনিক সংখ্যাতথ্যটি মুজিবকে লন্ডনে কোন একটি মহল কর্তৃক সরবরাহ করা হয়।

জহুরী তার বইয়ে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রমাণাদি সন্নিবেশন করার পরও কিছুটা সন্দেহ থেকে যায় যে প্রকৃতই মুজিবের সহকর্মীদের কারো মাধ্যমে উক্ত সংখ্যাতথ্যটি তাকে সরবরাহ করা হয়েছিল কিনা। এদিকে মুজিবের দল

[২] জহুরী, ত্রিশ লাখের তেলেসমাত, আশা প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

[৩] ঐ ১৯৭১ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে দৈনিক পূর্বদেশ- এর সম্পাদকীয় থেকে প্রদত্ত উদ্ধৃতি

[৪] ঐ

আওয়ামী লীগের সেই সময়কার সংসদ সদস্য জনাব আবদুল মোহাইমেন তার এক বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে মুজিব ছিলেন ইংরেজীতে একজন অর্ধ- শিক্ষিত লোক যিনি নয় মাসের অন্তরীণ ও একেবারে বিচ্ছিন্ন পরিবেশ থেকে মুক্তির পর অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে সংখ্যা ইংরেজীতে বলতে গিয়ে বিভ্রান্ত বা ভুলবশত ৩ লক্ষকে ইংরেজীতে থ্রি মিলিয়ন (যা বাংলায় ত্রিশ লক্ষ) বলে থাকবেন। ইয়াহিয়া খান [৫] ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি তার তীব্র ঘৃণা ও আক্রোশের ফলে একটি অসৎ প্রচারণা চালানোর উদ্দেশেও তিনি জ্ঞাতসারেই ৩ লক্ষকে বাড়িয়ে ৩০ লক্ষ বলে থাকতে পারেন।

যাই হোক, যে কারণেই হোক অনুমিত ৩ লক্ষ নিহত হবার ব্যাপারকে ৩০ লক্ষ বলা আর দুই লক্ষ মহিলার শ্লীলতাহানীর কথা মুজিব বলায় সেটাই তার রাজনৈতিক অনুসারীদের জন্য আপ্তবাক্য হিসেবে পরিগণিত হলো। ইতিমধ্যে কয়েক দশক অতিবাহিত হবার পরও উক্ত সংখ্যাটির সত্যাসতি যাচাই ও বিশ্লেষণ করার কোন উদ্যোগ আজও গৃহীত হয়নি।

নিহতদের রকমফের

১৯৭১ সালের সংঘাতের ঘটনা প্রবাহে পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ- এ যারা নিহত হয়েছিল তারা বহু শ্রেণী ও অভিধায় বিভক্ত। নিহতদের রকমফের বিশ্লেষণ করতে হবে সময় ও জাতিগত/ভাষাগত প্রভেদ- এ। নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকমহলের যে কেউই এটা স্বীকার করবেন যে হত্যাকান্ড কেবল ১৯৭১ সালের ২৫মার্চ তারিখে পাকিস্তানের ফেডারেল সেনা অভিযানের দিন থেকেই শুরু হয়নি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে সহায়- সম্পদে অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গা, লুটতরাজ ও হত্যাকান্ডের শুরু হয় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ যখন জাতীয় পরিষদের বৈঠক মূলতবী ঘোষণা করেন তখন থেকেই। পাকিস্তানের সংসদীয় রাজধানী তথা দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে পরিচিত ঢাকার শেরে বাংলা নগরের সংসদ ভবনে ৩রা মার্চ থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হবার কথা ছিল। ১ লা মার্চ এর পর থেকেই কোনরূপ উস্কানী বা প্রতিরোধ না থাকা সত্ত্বেও শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানের অবাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর হামলা, তাদের সহায় সম্পদ জালানো- পোড়ানো ও তাদের হত্যা করা।

[৫] কুতুবুদ্দীন আজিজ, সাম এক্সসাইটিং ষ্টোরিজ টু রিমেম্বার, দি ইসলামিক মিডিয়া করপোরেশান, করাচী, ১৯৯৫

অবাঙালীদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করার এই অভিযান অব্যাহত থাকে সংশ্লিষ্ট এলাকা সমূহে পাকিস্তান ফেডারেল সেনাবাহিনী না পৌঁছা পর্যন্ত। এটা অনেকেরই জানার কথা যে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের অনেক দূরবর্তী এলাকায় পৌঁছতে পারেনি। অর্থাৎ এটা সহজেই অনুমেয় যে ঢাকায় ২৫শে মার্চের সেনা অভিযানের পর থেকে প্রায় ৬ সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবাঙালিদের হত্যা করা হয়।[৬]

ঐ হত্যাকান্ডে কয়েক হাজার অবাঙালি নিহত হয় যাদের প্রকৃত সংখ্যা কখনও কেউ নিরূপণ করেনি; ফলে দুনিয়াবাসী তা আজও জানেনা। এক সময়ের পূর্ব পাকিস্তানে একাত্তরের ঘটনা প্রবাহে নিহত অবাঙালিদের ব্যাপারটা আজও রহস্যাবৃত্তই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ ও যাদুঘরে যুদ্ধ নিহতদের মাথার খুলি, হাড়- গোড়, ইত্যাদি যা নিহত বাঙালিদের বলে সংরক্ষিত রয়েছে সে সবের বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি নির্ণয় পূর্বক জাতিগত পরিচিত উদ্ভাবন করে এটা ঠিক করা উচিত যে ঐ সব মাথার খুলি ও হাড়- গোড় কি নিহত বাঙালিদের না তার মধ্যে অবাঙালিও ছিল অনেক। এটা নিশ্চিত হওয়া অপরিহার্য কেননা এর মাধ্যমে ১৯৭১ সালের সংঘাতে কত সংখ্যক অবাঙালি নিহত হয়েছিল এবং কত সংখ্যক বাঙালি নিহত হয়েছিল তার একটি প্রকৃত সংখ্যা ও হার নির্ধারণ করা সম্ভব।

অবাঙালী নিহত হবার কিছু দিক

অবাঙালি বিহারী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত পাকিস্তানের ফেডারেল সেনাবাহিনীর কিছু ক্ষুদ্র গ্রুপ ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এর কিছু ক্ষুদ্র গ্রুপ কিভাবে কচুকাটা হয়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে পাকিস্তানের ফেডারেল সরকার জেনেছে এবং জেনেছে পাকিস্তানের খ্যাতিমান সাংবাদিক ও কুটনীতিক জনাব কুতুবউদ্দিন আজিজ। পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সেই সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী নিয়ে যে স্বেতপত্র প্রকাশ করে তাতে এবং জনাব আজিজের লেখা ব্লাড এন্ড টিয়ারস[৭] বইয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের কারো কারো বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। সে সব বর্ণনায় কিভাবে একাত্তরের মার্চ- এপ্রিল- মে মাসে পূর্ব পাকিস্তানের

[৬] পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময় প্রকাশিত স্বেতপত্র থেকে এল,এফ রুশব্রুক উইলিয়মস কর্তৃক তার দি ইষ্ট পাকিস্তান ট্র্যাজেডী বইয়ে (টম ষ্টেচি, লন্ডন, ১৯৭২) প্রদত্ত উদ্ধৃতাংশ।

[৭] ১৯৯৪ সনের ডিসেম্বরে করাচীতে প্রকাশিত 'জুয়ে খুন' নিবন্ধে কতুবউদ্দিন আজিজ প্রণীত ব্লাড এন্ড টিয়ারস (১৯৭৪) বই থেকে প্রদত্ত উদ্ধতাংশ।

বিভিন্ন জায়গায় বর্বরোচিতভাবে অবাঙালিদের হত্যা করা হয় সে সবের কিছু কিছু লোমহর্ষক কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে যে সব আটকে পড়া পাকিস্তানীদের প্রত্যাবসনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের স্বাক্ষ্য ও বর্ণনা মতে অবাঙালি বিহারীদের অবস্থানস্থল পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল তথা শান্তাহার, সিরাজগঞ্জ, পাবর্তীপুর, নীলফামারী, দিনাজপুর, রংপুর, পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, যশোর প্রভৃতিস্থানে এবং পূর্ব- দক্ষিণ অঞ্চল চট্টগ্রাম, ফেনী, লাকসাম ও কুমিল্লায় কিভাবে অবাঙালিদের হত্যা করা হয় তার কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। অথচ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়া একজন পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালিকেও পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজন হত্যা কিংবা অত্যাচার বা হয়রানী করেনি। পক্ষান্তরে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও সত্যি যে একাত্তরের মার্চ- এপ্রিল- মে মাসে অসংখ্য অবাঙালিদের নিধন করার পর পূনরায় একই নিধন গণহারে চালানো হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানের পতনের পর পর। খ্যাতিমান বৃটিশ ঐতিহাসিক এল,এফ রুশ ব্রুক উইলিয়ামস তার বিখ্যাত দি ইস্ট পাকিস্তান ট্রাজেডী[৮] বই- এ অবাঙালিদের নির্বিচার গণহত্যার কিছু কিছু লোমহর্ষক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন যে সব গণহত্যা চালানো হয় একাত্তরের মার্চ- এপ্রিল- মে মাসে।

হত্যা এবং পাল্টা হত্যা

পাকিস্তানের ফেডারেল সেনাবাহিনী মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সারা পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং ততদিনে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীও সংগঠিত হয়। এর পরই শুরু হয় পাল্টা হত্যাকান্ড। সেনাবাহিনী গেরিলা যুদ্ধ ও সামনা সামনি লড়াই- এ হত্যা করে মুক্তিবাহিনীকে এবং কিছু ক্ষেত্রে অনেক বেসামারিক লোকও হত্যাকান্ডের শিকার হয়। এদের কেহ সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর মধ্যকার চলমান সংঘাতের মাঝে পড়ে নিহত হয়; কেউ হয়তো নিহত হয় সন্দেহের বশে সেনাবাহিনীর হাতে পড়ে। এই ধরণের হত্যাকান্ড চলতে থাকে জুন এর শুরু থেকে ডিসেম্বরে তিন তারিখ পর্যন্ত।

কত লোক ২৫ শে মার্চ থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছিল তার একটি পরিসংখ্যান নির্ণয় করে নিউইয়র্ক ভিত্তিক একটি জরিপ সংস্থা- সিওডব্লিউ (কো- রিলেটস অব ওয়ার) যা ১৯৮২

[৮] ঐ

সালে স্মল ও সিঙ্গার তাদের প্রকাশনায় উদ্ধৃত করেন; পরবর্তীতে ঢাকার বিআইআইএস এবং ত্রৈমাসিক জার্নাল ১৯৯৩ সনে অক্টোবর সংখ্যায় পুনঃউদ্ধৃত করে ডঃ এ, রব, খান। সিওডব্লিউর নির্ণীত হিসাব মতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকাকালীন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নিহত হয় ৫০ হাজার লোক।[৯]

কারো কারো মতে নির্ণীত ঐ সংখ্যা প্রকৃত হিসাবের চাইতে কম; তবে ঐ সংখ্যা বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে নিহতদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্যে আবেদনপত্র আহবান করার পর যত আবেদন জমা পড়ে সেই আবেদনপত্রের সংখ্যার কাছাকাছি।

তবে দু'টো সূত্রের সংখ্যা নির্ণয়ের মধ্যেই যথেষ্ট ফাঁক থেকে গেছে। কেননা নির্ণীত সংখ্যায় জাতিগত হিসেব দেখানো হয়নি। অর্থাৎ বাঙালি ও অবাঙালি সংখ্যা তার মধ্যে কত তা পৃথকীকরণ করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকার এটা পরিকল্পিতভাবেই করেছে যে নিহতদের বাঙালি- অবাঙালি শ্রেণীতে নির্ণয় করা যাবেনা। তবে অ- বাঙালিদের সকল হত্যাকান্ডকে ইনডেমনিফাই বা ক্ষমা করে দেয়া হয়।

দুই সপ্তাহের যুদ্ধকালীন সময়ের হত্যাকান্ড

আর একটি পর্যায়ে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। সেটি হচ্ছে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত দুই সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক যুদ্ধকালীন সময়। ঐ সংঘাতে লিপ্ত তিন পক্ষের তথা ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর লোক নিহত হয়। পূর্বে উল্লেখিত নিউইয়র্ক ভিত্তিক জরীপ সংস্থা সিওডব্লিউ কর্তৃক উক্ত হত্যাকান্ডের যে সংখ্যা নির্ণয় করা হয় তা হচ্ছে ১১,০০০ (এগার হাজার)।[১০]

একইভাবে বিআইআইএস তাদের ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাস সংখ্যার জার্নাল- এ সিওডব্লিউ'র উক্ত জরীপ তথ্য সন্নিবেশিত করে। তবে দেশভিত্তিক নিহতের সংখ্যা কত কিংবা বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর কত সদস্য নিহত হয়েছে তার কোন হিসাব পৃথকভাবে উক্ত জরীপে দেখানো হয়নি।

[৯] এ,রব, খান কনটেমপরারী ইন্টারন্যাশনাল কনফ্লিক্ট ইন সাউথ এশিয়া, এ কমপেনডিয়াম, বিআইআইসি ত্রৈমাসিক জার্নাল (ঢাকা), অক্টোবর, ১৯৯৩ইং সংখ্যায় প্রদত্ত সিওডব্লিউ, স্মল এন্ড সিংগার, ইউএসএ, ১৯৮২ (পৃ: ৪৪৩) এর নিহতের সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যের উদ্ধৃতাংশ।

[১০] ঐ পৃ: ৪৪৩

কিছু বুদ্ধিজীবির নিখোঁজ ও হত্যাকান্ড প্রসঙ্গ

যুদ্ধের শেষের দিকে তথা ১৩ ও ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে রহস্যজনকভাবে বিশেষত ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক সহ জনাকয়েক বুদ্ধিজীবি নিখোঁজ ও নিহত হয়। বিজয়ী মুক্তি বাহিনী ও ডিসেম্বর উত্তর বাংলাদেশ সরকার একাত্তরের অপরাপর হত্যাকান্ডের ন্যায় বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ডের সকল দায়- দায়িত্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী আল বদর, আল শামস ও রাজাকারদের স্কন্ধে চাপিয়ে দেয়। কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন যে কেহই এটা স্বীকার করবেন যে সেই সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী বাহিনীর কারো দ্বারা এই হত্যাকান্ড সংগঠিত হওয়া বাস্তব অবস্থায় সম্ভবপর ছিল না; কেননা তারা তখন ব্যস্ত ছিল নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ের জন্য কিংবা দেশ থেকে পালানোর জন্যে। আর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যস্ত ছিল বিভি জায়গা থেকে সবাইকে ঢাকায় এনে আত্মসমর্পনের জন্য জড় করানোর কাজে। সঙ্গতকারণেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী অন্যান্য বাহিনীর দ্বারা সেই হত্যাকান্ড ঘটানোর অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সদস্য এ্যাডভোকেট মজিবর রহমান ও ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দীন আহমেদ এমন বাস্তবতার কথাই প্রামাণ্যভাবে বলেছেন। এ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান আমার সাথে বহুবার অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তেমন বাস্তবতার কথা জোর আস্থার সাথে বলেছেন এবং ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দীন আহমেদ তার অকাট্য দালিলিক বই ন্যাশানালিজম অব ইসলাম (১৯৮২) বইয়ে সেই বাস্তবতার কথাই বলেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক যে আজ অবধি কোন সরকারই এই সব হত্যাকান্ডের রহস্য কিংবা কার্যকারণ উদঘাটন কিংবা প্রকৃত সত্য নির্ণয়ে কোনরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। ঢাকার পতনের সামান্য আগে একজন অতি একনিষ্ঠ পাকিস্তান পন্থী প্রফেসার মুনির চৌধুরীর অন্তর্ধান কিংবা নিহত হওয়া এবং ১৬ই ডিসেম্বরের সপ্তাহ দুয়েক পর জহির রায়হানের অন্তর্ধান কিংবা নিহত হওয়ার ঘটনা কিছুতেই পাকিস্তান পন্থী সামরিক বা তাদের সহযোগী বাহিনীর দ্বারা ঘটতে পারেনা; এটা অবশ্যই বিশেষ ভারতীয় বাহিনী তথা যুদ্ধের সময় কিংবা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা জেনারেল ওভানের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত মুজিব বাহিনী দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকবে। এর পক্ষে অকাট্য যুক্তি এবং তথ্য যতই থাকুকনা কেন বিষাক্ত প্রচারণার দাবানলে সবকিছুকে ভষ্ম করে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রচার মাধ্যম এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যে, এই হত্যাকান্ডের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা তাদের সহযোগী বাহিনীই কেবল

দায়ী। প্রসঙ্গত মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে উক্ত হত্যাকান্ডের একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কেন আজ অবধি করা হলোনা ? ১৯৭১ উত্তর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মুজিব সরকার তাদের নিজের মত করেই তদন্তানুষ্ঠান সম্পন্ন করা সত্ত্বেও তার রিপোর্ট কেন সাধারণ্যে প্রকাশ না করে সে রিপোর্টকে ধ্বংস করে দেয়া হয়? কেন মুজিব সরকার জহির রায়হানের নিখোঁজ কিংবা হত্যাকান্ডের তদন্ত রিপোর্ট ধামাচাপা দেয়? কেন মুজিব জহির রায়হানের বোন নাসিমা কবীরকে এই মর্মে হুমকি দিয়েছিল যে জহির রায়হানের নিখোঁজ ও হত্যাকান্ড সম্পর্কিত তদন্ত রির্পোট সাধারণ্যে প্রকাশ করার জন্য বেশী চাপাচাপি করলে তাঁর (নাসিমা কবীর) পরিণতিও ভাই জহির রায়হানের ন্যায় হতে পারে। মুজিবের সেই হুমকির নির্গলিতার্থ কি ছিল ? সেই হুমকি থেকে এটা কি স্পষ্টতই অনুমেয় নয় যে, জহির রায়হানের নিখোঁজ ও হত্যাকান্ডের সাথে মুজিব বাহিনীর সদস্যরাই জড়িত ছিল ?[১১]

জঘন্য হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর

১৬ই ডিসেম্বরের পর পরই একাত্তরের সব চাইতে জঘন্যতম হত্যাকান্ডের সমূহ ঘটনা ঘটে। বিজয়ী হাজার হাজার মুক্তি বাহিনী দেশের সর্বত্র নির্বিচারে হত্যা করে অসংখ্য বেসামরিক ব্যক্তি, রাজাকার, পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক কর্মী- সমর্থক, ইসলামিক পন্ডিত, আলেম- ওলামা এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের। রাজধানী ঢাকায় বাঙালি- অবাঙালি নির্বিশেষে পাকিস্তান রক্ষায় সক্রিয় ব্যক্তিদের পাইকারী হারে মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার ও সদস্যরা হত্যা করে। মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার কাদের সিদ্দিকী নিজে ঢাকা ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রকাশ্য জনসমাবেশে হত্যা করে পাকিস্তানপন্থী বাঙালিদের।[১২]

একইভাবে সারা দেশে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানপন্থীদের জনসমক্ষে হত্যা করে। বিশ্বস্ত সূত্রে থেকে আমার জানামতে সেই সময় উত্তরাঞ্চলীয় পাবনা জেলার

[১১] ওবায়দুল হক সরকার, বুদ্ধিজীবি হত্যাকারী কারা, মাসিক নতুন সফর, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৫ সংখ্যা, পৃ: ৭- ৮

[১২] আবদুল মালেক, ফ্রম ইষ্ট পাকিস্তান টু বাংলাদেশ, ইন্ডিপেন্ডেট কমিটি ফর হিউম্যান রাইটস, মানচেষ্টার, ১৯৭৩ পৃ: ৪ এবং ১১, ১৪ ও ১৭ পৃষ্টায় মুদ্রিত ৫টি ছবি- যে ছবিগুলোতে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানপন্থীদের নির্যাতনের মধ্য দিয়ে হত্যা করার দৃশ্য বিদেশী সাংবাদিকদের ক্যামেরায় ধারণ করা হয়।

সিরাজগঞ্জে পাকিস্তানপন্থী প্রচুর সংখ্যক অবাঙালি বিহারীদের ধরে এনে জেল ক্যাম্পাসে জড় করে তাদেরকে আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।[১৩]

সিরাজগঞ্জে বধ্য ঘর বলে একটা বাড়ী ছিল; যেখানে প্রথমে অবাঙালিদের পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের ধরে এনে হত্যা করা হতো এবং এটা ১৯৭৫ সালের মুজিবের পতন হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মুজিবের পতনের পর ঐ কসাই বা বধ্য ঘরের কর্ণধাররা ভারতে পালিয়ে যায়। আমি এই ঘটনা জানতে পারি ১৯৮৯ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নিউ জেল ডিভিশন ওয়ান- এ থাকাকালে আমার সাথে দেখা সিরাজগঞ্জের এক তরুণ যুবকের নিকট থেকে। উল্লেখ্য যে, এরশাদ সাহেব কোনরূপ অপরাধমূলক তৎপরতা না থাকা সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে আমাকে প্রথমে ৫৪ ধারা ও পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে সেই সময় গ্রেফতার করে জেলে ঢুকান। যাক সিরাজগঞ্জের প্রত্যক্ষদর্শী ঐ তরুণ হত্যাকান্ডের বহু লোমহর্ষক বিবরণ দেন।

তার বর্ণনামতে এক হত্যাকারী, যে মানুষ (পুরুষ- নারী- শিশু নির্বিশেষে) খুন করতে খুব আনন্দ পেতো, সে খুন করতো বেয়নেট চার্জ করে। কাকেও গুলি বা জবাই না করে বেয়নেট খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সে হত্যা করতে মজা পেতো। এই কাজে যাবার সময় উক্ত হত্যাকারী সারা গায়ে বোরকা জাতীয় একটি প্লাষ্টিকের পোষাক পরিধান করতো যাতে বেয়নেটের অব্যাহত খোঁচায় ফিনকি দিয়ে বের হওয়া রক্ত তার গায়ে না লাগে। মুজিবের শাসনের সময়কালে সংঘটিত হত্যাকান্ডের বিষয়াদির সত্যাসত্যি আমি যাচাই করতে পারিনি। তবে মুজিবের ব্যক্তিগত বাহিনীর দ্বারা এমনিতর খুন- খারাবি ছিল নিত্য- নৈমিত্তিক ব্যাপার।

এটা ছিল তাদের নিকট অনেকটাই ক্রীড়ার মত। একইভাবে নির্বিচার হত্যাকান্ড চালিয়েছে মুজিবের কুখ্যত রক্ষী বাহিনী যারা মুজিবের সরাসরি নির্দেশে চলতো। রক্ষী বাহিনীর হাতে ৩৭০০০ (অন্য এক পরিসংখ্যান মতে ৩২ হাজার) বেসামরিক ব্যক্তি ১৯৭২- ৭৫ সালের মধ্যে নিহত হয়। দুর্ভাগা এই দেশে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের এই সব হচ্ছে যতকিঞ্চিত প্রমাণ। মুজিবের পুত্র শেখ কামাল ও ভাগ্নে ফজলুল হক মনি ছিল মুজিবের তরুণ বয়সের মতকার একই গুন্ডা

[১৩] ঐ পৃ: ২৩: উক্ত পৃষ্টায় ১৯৭১- ৭২ সনে অবাঙালীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা সহ বিভিন্ন যায়গায় যেভাবে নির্বিচারে হত্যা করা হয় তার সংখ্যা ২০০০০০ বলে উল্লেখ করা হয়।

প্রকৃতির। অসাংবিধানিক রক্ষী বাহিনীর হত্যার শিকার হতো তারা যারা আওয়ামী লীগ ও ভারত বিরোধী ছিল এবং ছিল বাংলাভাষী মুসলমান।

একাত্তরের হত্যাকান্ডঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞানের আলোকে

একাত্তরের হত্যাকান্ডের সত্যিকার ঘটনাবলী বিধৃত করতে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান থেকে কিছু বলতে চাই। আমার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় পাকিস্তান আর্মিতে ছিল। এক পর্যায়ে সে পালিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সে মুক্তি বাহিনীর একজন সদস্য এবং একজন কোম্পানী কমান্ডার হিসেবে তার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার নিকট ১৯৭২ সালে বর্ণনা করেন। তার প্রদত্ত বর্ণনা মতে যুদ্ধকালীণ সময় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল সে তার কোম্পানী সহ ভারতের আশ্রয়স্থল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিজেদেরকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোক হিসেবে জনসমক্ষে পরিচয় দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীদের একত্রিত করে অনর্গল উর্দ্দুতে (আমার সে আত্মীয় ১৯৭১ সালের পূর্বে প্রায় ১০ বছর পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় অনর্গল উর্দ্দুতে কথা বলতে পারতো) পাকিস্তান রক্ষার (!) জন্য বক্তৃতা দিয়ে জনগণ থেকে পাকিস্তানের হেফাজতের জন্য অর্থ সাহায্য আদায় করে ভারতে তাদের আশ্রয়স্থলে ফিরে যাবার সময় জড় হওয়া বেসামরিক লোকদের উপর নির্বিচারে ব্রাস ফায়ার করে তাদের হত্যা করতো। ঐ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিরূপ ও বিক্ষুব্ধ ধারণা সৃষ্টি করা অর্থাৎ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বর্বর প্রকৃতির; যারা নির্বিচারে সাধারণ জনগণকে হত্যা করে থাকে। এই ধারণা পাকিস্তান বিরোধী ভারতের বিষাক্ত প্রচারণার জন্য ছিল অত্যন্ত সহায়ক। আমার আর এক বন্ধু ছিল মুক্তি বাহিনীতে। সেও আমাকে অনুরূপ ঘটনা সংগঠনের কথা বলেন এবং বলেন যে ঐ ধরণের হত্যাকান্ড পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হতো, যাতে পাকিস্তানীদের বর্বরতা সম্পর্কিত প্রচারণা প্রামাণ্য ও শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করে। এই ধরণের অপকর্মে তাদের যুক্তি ছিল যুদ্ধে এবং প্রেম-এ কিছুই ভুল নয়। এই সব ঘটনা প্রবাহ থেকে হত্যাকান্ডের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা দুস্কর এবং আরো বেশী দুস্কর হচ্ছে কে কাকে হত্যা করেছে তা নিরুপণ করা। একই প্রেক্ষাপটে কত মহিলা ধর্ষিত হয়েছে তার সংখ্যা নির্ণয় এবং কে এবং কেন ধর্ষিত হয়েছে তাও নিরূপণ করা দুস্কর। এই সব কারণেই মুজিব সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে হত্যাকান্ডের সংখ্যা ও কারণ নির্ণয় পূর্বক যখন নিহতদের ক্ষতিপূরণের একটা কার্যক্রম গ্রহণ করে, তখন প্রাপ্ত

বাস্তব তথ্য ও অবস্থার আলোকে সে কার্যক্রম পরিত্যক্ত করা হয় কেননা নিহতদের ক্ষতিপূরণের যে পরিমাণ আবেদনপত্র জমা পড়ে তার আলোকে সংখ্যা নির্ধারণ করা হলে মুজিব ও তার সহযোগীরা হত্যাকান্ডের যে কাল্পনিক, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিশাল সংখ্যার উপর প্রচারণা চালায় তা মুখ থুবড়েই কেবল পড়তোনা; ঐ মিথ্যাচারের জন্য আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতাও পদদলিত হয়ে যেতো।

১৯৮০ সালের শুরুতে লন্ডনে আমার সাথে আর এক মুক্তি যোদ্ধার সাক্ষাত ঘটে। সে আমার নিকট হত্যাকান্ড সম্পর্কিত আরো কিছু ভয়ংকর ঘটনাবলী বর্ণনা করে। মুক্তি বাহিনীর সদস্য হিসেবে ভারতে প্রশিক্ষণের পর তাকে দায়িত্ব দেয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সুনির্দ্দিষ্ট হত্যাকান্ড চালানোর জন্যে। তাকে এই সম্পর্কে একটি তালিকা ধরিয়ে দেয়া হয়। সে তালিকায় তারই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যারা মুসলিম লীগ কিংবা পাকিস্তান রক্ষায় ছিল সক্রিয়। মুক্তি বাহিনীর সে সদস্য আমাকে জানায় যে সে এমন ধরণের তালিকাভূক্ত তার অনেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে হত্যা করেছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের এক কর্মকর্তা হিসেবে কিছুদিন কাজ করে যখন একজন মুক্তি বাহিনী হিসেবে ১৯৭১ সালের ঐ সব হত্যাকান্ডে তার সম্পৃক্তিতে অনুতপ্ত হন; তখন লন্ডনে পালিয়ে যান। আমার সাথে আলাপচারিতার সময় তাকে স্পষ্টতই ঐসব হত্যাকান্ডের জন্যে অত্যন্ত অনুতপ্ত বলে মনে হয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর আর একজন সদস্য মুজিব সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা আমাকে জানান। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুজিব ঢাকার সিদ্দিক বাজার কম্যুনিটি সেন্টারে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য গেলে মুজিবের ঘনিষ্ট সে মুক্তি বাহিনীর সদস্য তাকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যেন তিনি (মুজিব) মুক্তি বাহিনীর সবাইকে অবিলম্বে তাদের অস্ত্র জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ জ্ঞাপন করেন; কেননা ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে সারা দেশে নির্বিচারে হত্যাকান্ড চলছে। মুজিব তার উক্ত অনুরোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেনঃ আমার ছেলেরা ১৯৫৪ সাল থেকে কিছু খেতে পায়নি, ওরা যখন কিছু খাচ্ছে -তাতে তোর এতো চোখ তাতাঁই কেন? প্রকাশ্যে অর্থাৎ একটা জনসমাগমে মুজিব এমন কথা বলার পর অবাঙালি ব্যবসায়ীদের একচেটিয়াভাবে হত্যা ও তাদের সহায় সম্পত্তি লুটতরাজ চলতে থাকে। এদের মধ্যে এমন বহু অবাঙালিও নিহত হয়; যারা ১৯৪৭ সালেরও বহু পূর্ব থেকে ঢাকায় ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে আসছিল। মুক্তি বাহিনীর অনেকে অবাঙালি ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করার পরও

তাদের অনেককে হত্যা করে। সেই সব হত্যাকান্ডের কোন খতিয়ান আজও নির্ণয় করা হয়নি - যা একটি স্বাধীন দেশের জন্য নিতান্তই দুঃখজনক। এটা নির্ণয় হওয়া সত্যিই একটি দেশের ভবিষ্যদের কল্যাণের জন্য অতীব প্রয়োজন, যাতে সত্যের প্রকাশ ঘটবে এবং যার মাধ্যমে অর্ধ সত্য কিংবা মিথ্যাচার যা স্কুল পাঠ্য বই সমূহে এই পর্যন্ত সন্নিবেশিত হয়েছে তা থেকে জাতি নিস্কৃতি পাবে।

হত্যাকান্ডের পরস্পর বিরোধী সংখ্যা

পঞ্চাশ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মরহুম হামিদুল হক চৌধুরী লিখিত মেমোয়েরস বইয়ে একাত্তরের সংঘাতে ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষ নিহত হবার কথা বলেছেন।[১৪]

তার প্রদত্ত সংখ্যা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা তিনি উক্ত সংখ্যা গণনার কোন ভিত্তি প্রদান করেনি। এছাড়াও জনাব চৌধুরী ১৯৭১ সালের শেষের দিকে বিদেশে ছিলেন এবং সেখান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। তার বইয়ে তিনি প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ে নিহতদের কোন শ্রেণীবিন্যাসও করেনি। ইংরেজী দৈনিক দি মর্নিং সান (ঢাকা) এর সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম ববি তার পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ নিবন্ধে মজিবের কথিত হত্যাকান্ডের সংখ্যা নিয়ে গুরুত্বর প্রশ্নের অবতারণা করেন। তিনি অংক কষে দেখিয়েছেন যে পাকিস্তানের ফেডারেল সেনাবাহিনীর হাতে ৩০ লক্ষ মানুষ নিহত হওয়ার অর্থ হচ্ছে ৯ মাসের তথা সাকুল্যে ২৬৭ দিনের প্রতিদিন ১১,২৩৬ মানুষকে হত্যা করা। এত ব্যাপক সংখ্যক লোককে হত্যা করা এবং লাশগুলো গুম বা সৎকার করা কারো পক্ষেই চাট্টিখানি কথা নয়। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র কর্মরত ৯০ হাজার সদস্যের পাকিস্তান বাহিনীর দ্বারা এমন অবিশ্বাস্য কাজ সম্ভব ছিল কিনা। এটা যে কোন কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরই নিকট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে বিবেচিত হবার কথা। বিএনপি সরকারের আমলে দু'দুবার মন্ত্রী হওয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা লেঃ কর্ণেল আকবর হোসেন মজিবের কথিত সংখ্যাতথ্যটিকে আজগুবী বলে আখ্যায়িত করেন।

জনাব আকবর হোসেনের মতে নিহতের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩ লাখ হতে পারে। আকবর বর্ণিত সংখ্যার সাথে অপূর্ব মিল রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জরীপ সংস্থা হাভার্ড গ্রুপ এর রিচার্ড সিশন ও লিউ রোজ প্রণীত ওয়ার এন্ড সিসেশানঃ বাংলাদেশ ডক্যুমেন্ট- এ দেয়া সংখ্যার সাথে। অবশ্য কর্ণেল আকবর তার বর্ণিত

[১৪] হামিদুল হক চৌধুরী, মেমোয়েরস, এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স লিঃ ঢাকা, ১৯৮৯ পৃ: ৩২৩

সংখ্যার ভিত্তি হিসেবে নিজের অভিজ্ঞানকেই গণ্য করেছেন। তার মতে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা এত কাপুরুষ ছিলনা যে ৯০ হাজার পাকিস্তানী নয় মাসে ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করে ফেলবে। তবে কর্ণেল আকবরের প্রদত্ত নিহতদের হিসেবেও জাতিগতভাবে সংখ্যা পৃথকীকরণ করা হয়নি; হয়তো তিনি নিজেই একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বিধায়। এদিকে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়কার ভারতীয় সেনা প্রধান জেনারেল মানেকশ পর্যন্ত ভয়ানকভাবে বিব্রতবোধ করেন মুজিব কর্তৃক নিহতের সংখ্যা হিসেবে ৩০ লক্ষ ঘোষণা করায়; কেননা মুজিবের উক্ত ঘোষণার পূর্বে বিবিসিকে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে জেনারেল মানেকশ সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ লোক নিহত হতে পারে বলে অনুমান নির্ভর একটি তথ্য প্রদান করেছিলেন, যার সাথে মুজিব প্রদত্ত সংখ্যার গরমিল ছিল রীতিমত আকাশ- পাতাল তুল্য।[১৫]

মুজিব সরকার শুরু করেও নিহতদের গণনা শেষ করেনি

নিহতদের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যে তাদের আত্মীয়দেরকে আবেদন করতে ১৯৭২ সালে মুজিব সরকার একটি প্রজ্ঞাপন জারী করে। একটি সূত্রমতে নিহতদের পক্ষ থেকে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৯৫ হাজার। আবার এর মধ্যে একই নিহতের পক্ষে ২টি এমনকি ৩টি আবেদনপত্রও জমা পড়ে। যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৫৫ হাজার- এ।[১৬]

সম্ভবত এই সংখ্যাটিই স্যাল ও সিঙ্গার (১৯৮২) তাদের জরীপ প্রকাশনায় সিওডব্লিউর সূত্রে উল্লেখ করেন। এই সংখ্যার কথা যখন ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি মুজিবকে তার সরকারী কর্মকর্তারা জানান তখন তিনি মারাত্মকভাবে বিব্রতবোধ করেন; কেননা এতদিনে তার কথিত ৩০ লক্ষ নিহত হবার কথা সাধারণ্যে তার জনপ্রিয়তার বদৌলতে অতি পবিত্র ও বিশ্বাস্য বলে গণ্য করা শুরু হয়। তার সরকারের কর্মকর্তাদের থেকে নিহতদের প্রকৃত সংখ্যার একটা ধারণা পেয়ে তিনি এতদসম্পর্কিত সকল নথিপত্র জ্বালিয়ে ফেলার জন্যে তাদের নির্দেশ জ্ঞাপন করেন। কেননা ঐ সব নথি- পত্র সংরক্ষিত হলে মুজিব একজন মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হবেন। ফলে এতদসংক্রান্ত সরকারী কোন নথি বা দলিল দস্তাবেজ কোথায়ও পাওয়া যায়না।

[১৫] এ,কে, এম রহুল আমিন, বিতর্কিত মুজিব, চিন্তন প্রমিতো প্রকাশনী, ঢাকা, বিএস, ১৩৯৯ (১৯৯৩) পৃ: ১৫

[১৬] জহুরী, ঐ

এতদসংক্রান্ত নথি, দলিল- দস্তাবেজ ধ্বংস করার প্রক্রিয়ার মধ্যেই মোট ৯ হাজার নিহতদের পরিবার- পরিজনদের ক্ষতিপূরুণের অর্থ প্রদান করা সম্প হয়। বস্তুতঃ ঐ নয় হাজারই একাত্তরের যুদ্ধে নিহত হয় বলে গণ্য করা যায়। ক্ষতিপূরুণের তালিকায় দুই লক্ষ নিখোঁজ কিংবা নিহত অবাঙালির কাকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। জনৈক আবদুল মালেক ১৯৭৩ সালে নিহত অবাঙালিদের সম্পর্কে একটা তথ্য প্রণয়ন করলেও তাদেরকে কোন ক্ষতিপূরুণ কখনও দেয়া হয়নি। একই কায়দায় মহিলা নির্যাতন ও ধর্ষনের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংখ্যাতথ্য প্রনয়নের জন্যে ১৯৭২ সালের শুরুতে সারা দেশে প্রচুর বীরঙ্গনা রেজিষ্ট্রেশন কেন্দ্র খোলা হলেও তা অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়; কারণ ঐ সব কেন্দ্রে নিবন্ধিত হওয়ার জন্যে নির্যাতিত- ধর্ষিত মহিলাদের পাওয়া যাচ্ছিলনা।

৩০ লক্ষের সংখ্যাতত্ত্ব নিতান্তই ভিত্তিহীন ও মারাত্মকভাবে ফুলানো-ফাঁপানো উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে ১৯৭১ সালের সংঘাতে ৩০ লক্ষ নিহত আর দুই লক্ষ মহিলা ধর্ষিত হবার কাহিনী কেবল ভিত্তিহীন ও আজগুবীই নয়; এই সংঘাত থেকে সত্যকে বহু দূরে হঠিয়ে দেয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জরীপ সংস্থা হার্ভাড গ্রুপ (সিশন ও রোজ- ১৯৯০) কর্তৃক ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ- এ যে তিন লক্ষ নিহত হবার কথা বলেছে তা বোধ হয় সত্যের কাছাকাছি। কেননা নিহত বাঙালিদের ক্ষতিপূরণের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা আর তার সাথে নিহত অবাঙালি দুই লক্ষ যোগ করলে হার্ভাড গ্রুপের জরীপকৃত সংখ্যার সত্যতা প্রমাণিত হবে। তবে বাংলাদেশ সরকার ৩০ লক্ষের যে জজবা টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট তার কোন ভিত্তি নেই; এটা নিশ্চিতভাবে অবিশ্বাস্য ও এক জঘন্য মিথ্যাচার বই আর কিছুই নয়। এটা বাংলাদেশ

সম্পর্কিত অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণার অংশ। তবে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে ৩০ লক্ষ আর দুই লক্ষ সংখ্যাতথ্যের মিথ্যাচার আমাদের মিডিয়া সমূহকে অব্যাহতভাবে যোগান বা ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে যাতে করে সাধারণ মানুষ এই নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করে; আর এই মিথ্যাচারকে স্কুলে পাঠ্য বইয়ে সন্নিবেশিত করে আমাদের উঠতি তরুণ বংশধরদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। আমরা কোন অবস্থাতেই আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মিথ্যাচার গলাধিকরণ বা অসত্যের জাবর কাটায় সোর্পদ করতে পারিনা। আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের অবশ্যই মিথ্যা ইতিহাসের বেড়াজাল ছিন্ন করে প্রকৃত সত্যের উদঘাটন করতে হবে। যুদ্ধে নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ে নতুন করে কোন নিরপেক্ষ জরীপ/গণনা এখনো

শুরু করা যেতে পারে; কেননা এখনো তেমন বিলম্ব হয়নি। নিহতের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম কর্তব্য; কেননা এতদসম্পর্কিত রেকর্ড শুদ্ধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে পাকিস্তানেরও কিছু নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। যদি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এই বিষয়ে সহযোগিতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ পূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তা হলে এর সুযোগ গ্রহণ করে ভারতীয়রা এতদসম্পর্কিত সকল মিথ্যাচারের ফুলঝুরি সৃষ্টি করে তাদের অসৎ প্রচারণাকে শান দিতে থাকবে; যা বাংলাদেশে গত সাড়ে তিন দশক ধরে চলছে।

এটা প্রত্যেকেরই স্মরণ থাকার কথা যে, ১৯৭১ সালের সংঘাতে নিহতদের এক চোখা ও বিকৃতভাবে সংখ্যা নির্ণয় এবং তা নিয়ে ১৯৭১ সাল থেকে পরিচালিত তারস্বরের অপ্রচারণা লক্ষ্য একটাই- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের আগ্রাসন চালানো।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও স্বার্থ সংঘাতের গতি- প্রকৃতি

মূল্যবোধের সংঘাতঃ একাত্তরের ডিসেম্বরে সৃষ্ট পরিণতিঃ পরবর্তী প্রেক্ষাপট

মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও স্বার্থের এক কঠিন সংঘাত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ- এর অভ্যুদয় ঘটে। সেই সংঘাত এর একটি পর্যায়ের পরিণতি ঘটে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে। ভারতীয় কংগ্রেসপন্থী আওয়ামী লীগের দাবীমত দৃশ্যতঃ এটা প্রতিভাত হয় যে, ঐ পর্যায়ে পাকিস্তানী মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে জয়ী হয় বাঙালি সংস্কৃতি। তাদের জয়ী হবার দাবীর কারণ ১৯৭১ সনের যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা একশ্রেণীর বাঙালি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেই পরাজয়কে পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের মাটিতে মুসলিম মূল্যবোধের পরাজয় হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা এও বলে যে, সীমান্তের বাইরে থেকে মুসলমানদের দ্বারা আনীত মূল্যবোধ ছিল বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম নেয়া মূল্যবোধের পরিপন্থী। এরই ফলে শেখ মজিবের নেতৃত্বে নতুন বাঙালি শাসকরা পূর্ব থেকে বিদ্যমান মুসলিম পরিচয় জ্ঞাপক সকল প্রতীক, নাম ও পদচিহ্ন পরিবর্তন করে ফেলে। এমনকি কোরানের অনেক বাণী যেমন 'রাব্বী যিদিন ইলমা' 'ইক্রা বিস্মি রাব্বিকা আল লাজী খালাক' যা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম- এ অংকিত ছিল, তা পরিবর্তন করে সেখানে এমন কিছু বাংলা বাক্য বা শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয় যেগুলোর মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবনের কোন দিক- নির্দেশনা বা অনুপ্রেরণা নেই। এমনকি নতুন বাঙালি শাসকরা মুসলমান পরিচয় জ্ঞাপক সকল কিছুকে বর্হিদেশীয় এবং সংশোধনযোগ্য বলে চিহ্নিত করে এবং সকল সরকারী প্রচার মাধ্যমে ইসলামী প্রতীক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। অনৈসলামিকীকরণের এই সব কর্মসূচী মূল্যায়ন করলে বোধশক্তি সম্পন্ন যে কারোরই নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে ওটার লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্টদের বিবেচনায় বাঙালি প্রথা ও মূল্যবোধকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বৈদিক ও হিন্দু পুরান এর ঢামাঢোলে তাদের সকল মূল্যবোধ নিমজ্জিত করার অপপ্রয়াসে হয়তো বাঙালি মুসলমানরা বিস্মৃত হতোনা; কিন্তু যে সব মূল্যবোধের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, তা তাদের নিকট কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। বস্তুতঃ পৌরনিক পূর্বযুগের অন্ধ সাধু

দীর্ঘতমার- এর জারজ সন্তান 'বঙ্গ'র ব্যক্তিত্ব ও আচারাদির মধ্যেই তারা জাতির উৎসের সন্ধানে ব্যপৃত হয়।[১]

এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বাংলাদেশের এমনকি স্বল্প সচেতন মুসলমান ও বোধবুদ্ধি সম্পন্ন যে কেহরই ঘৃণাভরে এমনিতর অনৈতিহাসিক ইস্যু সমূহ নিশ্চিতভাবেই প্রত্যাখান করার কথা।

ধর্ম নিরপেক্ষতা নাকি অনৈসলামিকীকরণ ?

পরিচয়ে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭১ উত্তর বাংলাদেশের শাসকরা দেশের জন্য এমন এক জাতীয় সঙ্গীত প্রবর্তন করে যাতে ছিল বহু- ঈশ্বরবাদী হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস- সঞ্জাত এবং ছিল একেশ্বরবাদী মুসলমানদের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেবল তাই নয়, উক্ত সঙ্গীতের প্রথম লাইন 'আমার সোনার বাংলা.....' এর ঐতিহাসিক কার্যকারণ হচ্ছে এই যে এটা বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় রচিত হয় এক ও অবিভক্ত বাংলার বন্দনায়; আজকের বাংলাদেশ হচ্ছে সেই মূল বাংলা প্রদেশ এর অর্ধেক। এটা অনেকেরই জানা যে এই বন্দনা সঙ্গীত ১৯০৫ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন যার একই সময় রচিত আর একটি বন্দনাগীত অর্থাৎ 'জনগণ মন.....' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ১৯৫০ সালে ভারত রিপাবলিক ঘোষিত হবার পর গৃহীত হয়। ইতিহাসে এটা স্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত আছে যে প্রথম বন্দনা গীত (যা বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় সঙ্গীত) রচনা করা হয় বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠন করতে বাঙালি হিন্দু কর্মীদের উজ্জীবিত করার জন্য। ইতিহাস স্বাক্ষী যে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার হিন্দুদের সে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল পশ্চিম বাংলা ও কলকাতার পশ্চাৎভূমি হিসেবে পূর্ব বাংলাকে শোষণ করার ক্ষেত্র অক্ষুন্ন রাখা এবং একই সাথে ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গের পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার সামগ্রিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করা। ঠাকুর এই বন্দনা গীত ১৯০৫ সনের ৭ই

[১] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, হিস্ট্রী অব এনসিয়েন্ট বেঙ্গল, সি ভাদোরওয়াল এন্ড কোঃ, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ: ২৮ এবং বি,সি,সেন, হিষ্টোরিক্যাল এসপেক্টস অব বেঙ্গলী ইনসক্রিপশানস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২, পৃ: ৮

আগস্ট দুই বাংলা পুনঃএকত্রীকরণের দাবীতে কলকাতা টাউন হলে আয়োজিত গণ সমাবেশে প্রথম গেয়েছিলেন। [২]

বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে বঙ্গভঙ্গ রদ তথা অবিভক্ত বাংলার সে আন্দোলনের আর একটি লক্ষ্য ছিল হিন্দুত্ববাদীতার পুনরুজ্জীবন যার মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতার কোন ব্যাপার ছিলনা। এই সম্পর্কে বাঙালি লেখক ও ঐতিহাসিক নিরোধ চন্দ্র চৌধুরী খুব চমৎকারভাবে কিছু কথা বলেছেন। নিরোধ বাবু লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবোধ ছিল হিন্দুত্ববাদ থেকে উৎসারিত।[৩]

বাঙালি হিন্দুদের জাতীয় অনুভূতির লক্ষ্যই ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি করা। তাঁর নিজ ভাষ্যঃ 'হিন্দুতে যতটা না শ্রদ্ধা তার (রবীন্দ্রনাথ) ছিল তার চাইতে অনেক বেশী ছিল মুসলিম বিদ্বেষ[৪] অর্থাৎ হিন্দুরা যতটা না তাদের নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তার চাইতে বেশী তাদের ঘৃণাবোধ রয়েছে মুসলমানদের প্রতি।' অত্যন্ত স্পষ্টবাদী নিরোধ বাবু সত্যের উন্মোচন করতে গিয়ে তার নিজ ভাষ্যে আরো বলেনঃ 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে বাঙালির নবহিন্দুত্বের সর্বাত্মক প্রকাশ ঘটেছিল।'[৫]

জাতীয় কবির সাথে জাতীয় সঙ্গীতের বিরোধ

এটা অত্যন্ত কৌতুহলজনক যে বহু সংগ্রামী, ত্যাগ- তীতিক্ষাময় ও দিক- নির্দেশক সঙ্গীতের জনক কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশ জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করে তাঁর রচিত দেশাত্ববোধক যে কোন একটি সঙ্গীতকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত করা যেতো; কিন্তু বাংলাদেশ তা করেনি। যে কেউ এর কারণ খতিয়ে দেখতে পারেন। অতি সঙ্গতভাবেই যে কাররই মনে এমন প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে কি রবীন্দ্রনাথের সে বিতর্কিত বন্দনা গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না ?

---

[২] এম,এ, আজিজ, ক্যান দেয়ার বি ডিউরেবল পীস ইন দি সাব- কন্টিনেন্ট, ডাহুক পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৮ পৃ: ১৩

[৩] নিরোদ সি, চৌধুরী, আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথঃ আত্মঘাতী বাঙালী, দ্বিতীয় খন্ড, মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স (প্রাইভেট) লিঃ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ : ১০১

[৪] ঐ পৃ: ১০১

[৫] ঐ পৃ: ১০৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বৃটিশ যুগের সৃষ্ট জমিদারী প্রথার এক বড় ক্রীড়নক, যার জমিদারীতে মুসলমানরা নানাবিধভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছিল। আর কাজী নজরুল ইসলাম, যার কাজী নামটি থেকেই এটা স্পষ্ট যে তিনি ছিলেন একটি বনেদী মুসলমান পরিবারের সদস্য; কিন্তু ছোটকাল থেকেই দারিদ্র্যপীড়িত পারিবারিক অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি বেড়ে উঠেন। সন্দেহ নেই যে, ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের একজন বড় কবি ছিলেন। কিন্তু তার জীবনাচারের ভিত্তি ছিল হিন্দুত্ববাদ এবং তার কবিত্বের মূল উৎস ছিল হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র উপনিষদ।

অনেকে বলে থাকেন যে, ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে ঠাকুরের ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস কী ছিল। তবে ১৯০৫ সালে রচিত তার বন্দনা গীতটি ছিল অবিভক্ত বাংলা পুনঃ প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবনমূলক এবং যে বন্দনাগীত এর প্রতিপাদ্য ছিল ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় উভয় দৃষ্টিকোন থেকে তদানীন্তন পূর্ব বাংলা প্রদেশ তথা আজকের বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্ত্বা, পরিচয়, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে কেহ সেই সময়কার ঐতিহাসিক কার্যকারণ ও বিষয়াদীর নিরাবেগ বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই অনুধাবণ করতে পারবেন যে শত বর্ষ পূর্বে দুই বাংলাকে এক ও অবিভক্ত রাখার লক্ষ্যে রচিত ঠাকুরের সে বন্দনা গীত এর মর্মবাণী ঠাকুরের নেতারা তথা ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি ও হিন্দু মহাসভার নেতারাই পদাঘাত করেন; কেননা ১৯৪৭ সালে (অবশ্য তার কয় বছর আগে ঠাকুর মশাইয়ের মহাপ্রয়ান ঘটে) তারা পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর বাইরে রেখে দুই বাংলার সমন্বয়ে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে- যা বাংলার মুসলমানরা চেয়েছিল। অথচ ১৯৭১ সালে প্রবর্তিত ঠাকুরের সে বন্দনা গীতকে জাতীয় সঙ্গীতে অভিষিক্ত করা হয় যে গীত এর মর্মকথা হচ্ছে এক ও অবিভক্ত বাংলা। কি মর্মান্তিক বৈসাদৃশ্য !

ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী দর্শন নির্ভর এই জাতীয় সঙ্গীত আওয়ামী লীগের অনেক সিনিয়ার নেতাও পছন্দ করেনি। কিন্তু তাদের কিছুই করার ছিলনা; যেহেতু তারা ভারতীয় প্রভূদের পা চাটা হিসেবে ছিল অসহায়। মুজিব কর্তৃক দেশের নাম হিসেবে প্রদত্ত বাংলাদেশ এর প্রতিও জনগণের কোন সমর্থন বা অনুমোদন ছিলনা। গুরুতর এই বিষয়ে জনগণের কোন সম্মতিও নেয়া হয়নি।

বাংলাদেশ নামটি নেয়া হয়েছে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র পুরান ও মহাভারতে বর্ণিত 'বঙ্গ' থেকে- যা হিন্দুদের নিকট অতি প্রিয়; কিন্তু সচেতন মুসলমানদের

নিকট কিছুতেই নয়; যেহেতু তারা 'বঙ্গ'-এর নামের পটভূমি জানে। সেজন্য মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশ এর স্থলে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে দেশটির নাম রাখার জন্য জোর দাবী জানিয়েছিলেন। জাতীয় পতাকার মধ্যে লাল সূর্য বহু দেবত্ববাদী হিন্দুদের কথিত সূর্য দেবতাকেই প্রতিভাত করে, যা আল্লাহর একেশ্বরবাদীতায় বিশ্বাসী মুসলমানদের নিকট কিছুতেই সুখকর হতে পারেনা। অন্যান্য জাতীয় প্রতীক, মনোগ্রাম, তঘমাতে মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য- বিশ্বাস- মূল্যবোধের কোন পরিস্ফুটন নেই; আছে বহুদেবত্ববাদী হিন্দুত্বের পরিস্ফুটন। এসব থেকে যে কোন সচেতন মানুষের পক্ষেই এটা স্পষ্টতই বোঝা সম্ভব যে, ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত মুজিবের শাসনামলে গৃহীত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিমালার আবডালে পরিকল্পিতভাবে ভারতীয়করণ ও হিন্দুত্বকরণের খেলাই চলেছে। যদিও ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সফল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারতীয় ও হিন্দুত্বকরণের খেলা বন্ধ হলেও পরবর্তী সরকার সমূহের আমলে সে খেলার নানারূপে পুনরাভির্বাব ঘটে এবং তা অনেকটা পৌঁছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত ১৯৯৬-২০০১ সালের পাঁচ বছর সরকারের সময়কালে।

ক্ষমতা থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের পতনের যৌক্তিকতা

বাঙালি সংস্কৃতির ধারকবাহকরা ক্ষমতা বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনি। কারণ তারা জনগণের অনুভূতি, আশা- আকাংখা ও গভীরভাবে আকড়ে রাখা আদর্শাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও জনগণ তাদের মৌলিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জীবনাচারের অনেক কিছুই পরিত্যাগ করেনি। মুজিবের পতনের পিছনে তেমন কোন বিদেশী শক্তির প্রত্যক্ষ হাত বা কারসাজী নেই, আভ্যন্তরীন ব্যর্থতা তথা মুজিব নিজেই তার পতনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন; কারণ তিনি যাদের ভোটে ক্ষমতায় আরোহন করেন সে সাধারণ জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও মূল্যবোধের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা বা সমীহ জানাতে তিনি ব্যর্থ হন। যার দরুণ তার নিজের লোকজন ও মুক্তিযোদ্ধারাই তাকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামায়। পতনের পর অভ্যুত্থানকারীরা যথার্থই বলেছিলঃ জনগণের বিশ্বাসের অমর্যাদা ও তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ম্যান্ডেট মুজিবকে কেউ দেয়নি এবং দেশ থেকে কোরানের বাণী, জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মনোগ্রাম- তঘমা থেকে মুসলমানী প্রতীক ও চিহ্ন সমূহ অপসারণের জন্যে কোন মুসলমান মুজিবকে ভোট দেয়নি। মুজিব প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল সরাসরি মুসলিম আদর্শ, মূল্যবোধ

এবং রীতিনীতির বিরুদ্ধে; অথচ তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার কোন বিরোধীতা ছিলনা খৃষ্টীন, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের বিশ্বাস ও জীবনাচারের সাথে। উদাহরণ স্বরূপ এটা উল্লেখ্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলিম নামাংকিত অথবা মুসলিম নামানুসারের মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ছুরি চালিয়ে জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ফজলুল হক মুসলিম হল এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সমূহের নাম থেকে মুসলিম শব্দ সমূহ ঝেটিয়ে বিদায় করা হলো; অথচ রামকৃষ্ণ হিন্দু মিশন অথবা ভোলানাথ হিন্দু একাডেমীর নাম- এ কোন পরিবর্তন করা হলো না; হলো না হলিক্রস কলেজ, নটরডেম কলেজ, সেন্ট গ্লেগরী স্কুল সহ বিভিন্ন খৃষ্টীয় ও হিন্দু প্রতিষ্ঠানের, যেগুলো বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের ন্যায়ই অপরিবর্তিত থাকে। প্রসঙ্গত এটা উল্লেখের দাবী রাখে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভারতে কিন্তু এইভাবে কোন ধর্মীয় নাম বা প্রতীকে ছুরি চালানো হয়নি। হিন্দুরা সংখযগারিষ্ঠ হওয়ায় সেখানে জাতীয় কোন প্রতীক ও কোন প্রতিষ্ঠানে হিন্দুত্ববাদী প্রতীক চিহ্ন ব্যবহারে কোন বাধাই নেই। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শুরু হওয়ায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের নামের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আজও সে নামেই চলছে। অথচ বাংলাদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে জাতীয় প্রতীক, মনোগ্রাম, তঘমা কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানে মুসলিম প্রতীক ও নিশানা ব্যবহার করা যায়না। ভারতপন্থীরা বরাবরই এই ক্ষেত্রে স্বাধীনচেতা হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি, কেননা তারা দিল্লীর হাতের পুতুল বা ক্রীড়নকের ভূমিকাই সব সময় গ্রহণ করে। জনগণ অবশ্য তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতা তথা অনৈসলামিকীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কোন পরিবর্তনকেই পছন্দ করেনি এবং করবে না। ফলে মুসলিম মূল্যবোধ, পরিচয় ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে কোন আঘাতই অতীতে বিরোধীতা ছাড়া যায়নি এবং সে আঘাতকে প্রত্যাঘাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের নানাবিধ অপকর্ম তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং তাদের ক্ষমতার ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। মুজিবের বিশাল জনপ্রিয়তার পটভূমিতে মাত্র অতি স্বল্প সময়ে তথা মাত্র সাড়ে তিন বছরে মুজিবের শাসন তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক- বাহকরা পরাস্ত হয় তাদেরই হাতে, যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে যে কোন মূল্যে উচ্ছ্রকিত রাখতে বদ্ধপরিকর।

সীমান্তের বাইরে থেকে তাদের প্রভূদের মদদ ও পৃষ্টপোষকতায় বাংলাদেশের জনগণের অব্যাহত মুসলিম মূল্যবোধ পরাস্ত করার জন্য বাঙালি

জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীরা ১৯৭৫ সালের পর থেকে নানাবিধ অপচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও টিকে থাকার মত কোন সাফল্য তারা লাভ করতে পারেনি। সীমান্তের বাইরে থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারকরা সর্বধরণের সহায়তা, পৃষ্টপোষকতা এবং বস্তুগতঃ সমর্থন লাভের পরও মুসলিম মূল্যবোধ, নীতি আদর্শ ও সংস্কৃতিকে তারা সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পরাস্ত করতে পারেনি। তবে একদিকে মুসলিম মূল্যবোধের অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং অন্যদিকে দুইটি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির চলমান দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এর পরিণতি কে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ?

বাংলাদেশে ইসলামী মূল্যবোধের শিকড় সহস্র বছর ধরে প্রোথিত

দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নতুন হলেও জনগণের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বহু পুরনো। প্রায় সহস্র বছর ধরেই তারা স্থানীয় বাঙালি মূল্যবোধের উপর জয়ী হয়ে এসেছে। এটা নিতান্তই সহজাত যে কোন শক্তিশালী ও প্রগাঢ় মূল্যবোধ ঐতিহাসিক পরিক্রমনের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত দূর্বল মূল্যবোধকে পরাস্ত করে যা প্রতিটি মানব সমাজেরই বাস্তবতা এবং বাংলাদেশের মাটিতেও একই বাস্তবতার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। বাংলাদেশ অঞ্চলে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে স্থানীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি কেবল অতি প্রাচীনই ছিলনা; তা ছিল মানুষের সকল রিপুর দ্বারা সংক্রমিত। সামন্ত প্রভূদের শোষণ ছিল সে সব কথিত মূল্যবোধের ভিত্তি। সাধারণ মানুষের কোন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিলনা; এমনকি মানুষ হিসেবে তাদের অধিকারের কোন মানদন্ড ছিলনা। তবে এতদঞ্চলে মুসলমানদের আগমনের পর- যা হয়তো পীর-আওলিয়া-সুফিরা শুরু করেছিল অষ্টম শতকের শুরুতে কিংবা তের শতাব্দীতে বিজয়ী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর আমল শুরুর পর থেকে যে মূল্যবোধ, পদ্ধতি, মানবিক গুণাবলী চালু হয়, তার মধ্যেই মানবিকতার সঠিক দিক-নির্দেশ প্রতিফলিত হয়।

তবে মূল্যবোধের সে মানবিক রূপ পরিগ্রহ করা কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা। মূল্যবোধকে মানবিক রূপ পরিগ্রহ করতে হয়েছিল স্থানীয় মূল্যবোধের কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে সংগঠিত নানাবিধ প্রতিরোধ ও বহু সংগ্রামকে মোকাবেলা করার মধ্য দিয়ে; যে কায়েমী স্বার্থের উৎস ছিল হিন্দুত্ববাদ -যা ছিল মানুষের সমানাধিকার জীবন ধারণের স্বাধীনতা ও সম্পদ এর উপর সমান অধিকার এবং সকল নাগরিকের সমান স্বাধীনতার পরিপন্থী। স্থানীয় বাঙালি মূল্যবোধ ছিল হীনমন্যতা-উচ্চমন্যতাবোধ ও খাটি-দূষণে দোলায়িত; যার ফলে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের শ্রেণীভেদ প্রথা চালু করা হয়। হিন্দু বিশ্বাস মতের

বর্ণভেদ প্রথা মানুষের সকল ধরণের মর্যাদা বিরোধী, যদিও বর্ণভেদী সেই সমাজ একই এলাকায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করে আসছে।

বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামের আগমন ও প্রতিষ্ঠা বাইরে থেকে আসা হলেও সামাজিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নতরভাবে রূপ পরিগ্রহ করে। এটা সত্যি যে সবকিছু দ্রুত বা একরাতের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়নি। তবে ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত মূল্যবোধের শক্তি এমনি যে এটা অনেক কিছুরই পরিবর্তন অতি দ্রুত তথা রাতারাতি কিংবা বলা যায় এক রাতের ব্যবধানেই ঘটিয়ে ফেলে। স্থানীয় অমুসলিম শাসকরা নতুন মূল্যবোধকে প্রতিরোধ করার সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইসলামিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ঢেউ তাদের সব প্রতিরোধকে গুড়িয়ে দেয়। যার দরুণ ষোল শতাব্দীতে মোগল রাজত্বের মাঝামাঝি সময়তেই সারা ভারতীয় উপমহাদেশ মুসলিম মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সর্বোচ্চ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। স্থানীয় পর্যায়ের কিছু কিছু সংস্কৃতির অস্তিত্ব থাকলেও তা প্রভাব সৃষ্টি করার সকল ক্ষমতা হারিয়ে ইসলামী মূল্যবোধের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের আওতায় আসে। এই সংস্কৃতি খাদ্যাভাস ও পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ নির্মাণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বর্ণ হিন্দুদের সহায়ক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য বৃটিশদের উদ্যোগ

শাসক হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশদের অভ্যুদয় ঘটার পর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূল এবং সে স্বার্থের সেবক হিসেবে নতুন এক মূল্যবোধ ব্যবস্থার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার কোশেশ শুরু হয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এই কোশেশ শুরু হয় বাংলাদেশের মাটিতে নবনির্মিত শহর কলকাতাকে এর রাজধানী বানানোর মধ্য দিয়ে। তাদের প্রথম আক্রমণ ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। বৃটিশরা ৭০০ বছরের পুরনো এবং ভালভাবে সংগঠিত মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা ১৮৩৩ সালে রাতারাতি বদলিয়ে ফেলে। তদস্থলে তারা ম্যাকলে মাইনিউটস বাস্তবায়নের দ্বারা প্রবর্তন করে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার- - যার লক্ষ্য ছিল এইরূপঃ 'রক্তে এবং রং-এ ভারতীয়, রুচিতে-মতাদর্শে-নৈতিকতায় এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ' (জেপি নায়েক ও এস নুরল্লাহ ১৯৯৬ পৃ: ১০১) হিসেবে গড়ে তোলা। ১৮৩৭ সালে সরকারী ভাষা হিসেবে ফার্সী ভাষার বিলুপ্তির পর পরই ইংরেজীকে সরকারি ভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। ফলে এক রাতের ব্যবধানে ফার্সী শিক্ষিত মুসলমানরা অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীতে পর্যবসিত হয়। নব্য ইংরেজী শিক্ষিত স্থানীয়

হিন্দুদের দ্বারা ফার্সী শিক্ষিত মুসলমানদের চাকরীচ্যুত করা হয়। আর এই সুযোগে ভাগ্যগড়ার পেশা এবং ইজ্জত সম্মান অর্জনের পথে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুরা একচ্ছত্রভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এটা অনেকেরই মনে থাকার কথা যে শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন, ১৭৯৩ সালে ভূমির 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা' এবং মারাত্মকভাবে প্রবর্তিত ১৮৪১ সালের 'সূর্যাস্ত আইন'-এর বদৌলতে মুসলিম ভূস্বামীরা এক রাতের ব্যবধানে নিঃস্ব ও ভূমিহীন- এ পরিণত হয়। মুসলমানরা অশিক্ষিত ও দরিদ্র হয়ে পড়ে। নেটিভ বা স্থানীয় বাঙালি ভদ্রলোক হিসেবে উচ্চ বর্ণ হিন্দুরা নতুন ভূস্বামী শ্রেণীই কেবল নয়; তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা কেন্দ্রীক বিভিন্ন ইংরেজী শিক্ষিত পেশার লোকের অভ্যুদয় ঘটে। বৃটিশ শিক্ষা, পেশা বা বাণিজ্য নীতির সে লক্ষ্যই ছিল 'বাঙালি ভদ্রলোক' সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্য অর্জনে বৃটিশরা ব্যাপকভাবে সাফল্য মন্ডিত হয়।

এই পর্যায়ের বাঙালি ভদ্রলোক হিসেবে বৃটিশদের পৃষ্টপোষকতায় অভ্যুদয় ঘটে উচ্চ বর্ণের হিন্দু ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জী, শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ; যাদের পাশাপাশি সমসাময়িক কোন বাঙালি মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন না।

সহসাই সমগ্র ভারতের বিশেষত বাংলার মুসলমানরা বৃটিশ ভারতীয় উপমহাদেশের অপরাপর অনগ্রসর গরীব জনগোষ্ঠীর ন্যায় ভাগ্যবিড়ম্বনায় পর্যবসিত হয়ে বর্ণ হিন্দু ও শিক্ষিত স্বচ্ছল হিন্দুদের চাইতে অনেক পিছিয়ে পড়লো। বৃটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম উইলসন হান্টার পর্যন্ত এটা স্পষ্টতই উপলব্ধি করলো যে এতে মুসলমানদের আহত করা হয় চরমভাবে। ১৮৭১ সালে সে ভারতে একশত বছরের বৃটিশ শাসনে কি দুর্ভোগ- দুর্দশা ও বদনসীব মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি করা হয় তার প্রামাণ্য কিছু তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করে হান্টার একটি অনবদ্য ইতিহাস রচনা করেন। পূর্ব বাংলা ছিল বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী অথচ তাদের দারিদ্র্যের সাথে তুলনীয়ভাবে বর্ণ হিন্দুদের স্বচ্ছলতা ছিল অত্যন্ত লক্ষ্যনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। ঐতিহাসিক হান্টার- এর নিজ ভাষ্য মতে। '১৭০ বছর আগে বাংলায় জন্ম নেয়া ভাল বংশজাত একজন মুসলমানের পক্ষে গরীব

হয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল; আর এখন কোন মুসলমানের পক্ষে তার স্বচ্ছলতা টিকিয়ে রাখাই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[৬]

বাংলার সেই সময়কার সমগ্র অবস্থা সম্পর্কে হান্টার- এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান ছিল অনেক। কেননা তিনি ছিলেন সেই সময়ের বৃটিশ সরকারের একজন সিনিয়ার আমলা যার বাংলার সমসাময়িক পরিস্থিতির বিভিন্ন দিকের প্রকৃত তথ্য এবং জ্ঞান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের ছিল অবারিত সুযোগ। আর সেই সুবাদেই তার বইতে সন্নিবেশিত হয় সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের মাঠ পর্যায়ের প্রামাণ্য তথ্যাবলী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন কিছু সমালোচকের আবির্ভাব ঘটে যাদের মতে হান্টারের ঐ মন্তব্য নাকি ছিল 'ভুল'! প্রসঙ্গত হান্টার তার মন্তব্যের অনুকূলে যে সব প্রামাণ্য উপাত্ত সন্নিবেশন করেন তা থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করতে চাই। ১৮৭১ সালে বাংলার ২১১১ জন নিয়োগপ্রাপ্ত অধঃস্তন সরকারি কর্মচারীর মধ্যে ১৩৩৮ জন ছিলেন ইউরোপীয়, হিন্দু ছিল ৬৮১ জন আর মুসলমান ছিল মাত্র ৯২ জন।[৭]

ঐতিহাসিকরা এটা ভাল করেই জানে যে, ঐ সময়ের কোন কর্তৃপক্ষই হান্টার প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্তবলী চ্যালেঞ্জ করতে পারবেনা। মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার পিছনে মুসলমানরা যে মোটেই দায়ী নয়, আমি এটা বলবোনা; আমি শুধু এটাই উল্লেখ করতে চাই যে, মুসলমানরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত সকল দিক থেকে উন্নত সম্প্রদায় হিসেবে অবস্থান করার পর কিভাবে এত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাদের পতন ঘটলো এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু পিছনে পড়ে গেল ? এই সম্পর্কেও হান্টার বলেছেনঃ "ভারত ভূখন্ডের প্রাক্তন বিজেতারা দৃশ্যপট থেকে ছিটকে পড়ার পর ধন্যবাদের সাথে হিন্দুরা রুটি হালুয়ার ভাগ নিতে থাকলো আর ততদিনে ইংরেজরা দৃশ্যপটে কেবল কিছু গোমস্তা আর পুরোহিত নিয়ে আবির্ভূত হলো।" [৮]

যে সব মন্তব্য তথ্য এবং বর্ণনাদি এখানে উল্লেখ করা হলো তা থেকে এটা স্পষ্ট যে মুসলমানরা কেবল অর্থনৈতিকভাবেই নয়; পেশাগতভাবেও পিছনে পড়ে গেল ইংরেজী শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে রাখার কারণে, যার ফলে

---

[৬] ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, প্রথম বাংলা সংস্করণ, বর্ণলিপি মুদ্রায়ণ, ঢাকা পুনঃমুদ্রিত ৫ম সংস্করণ (মূল পান্ডুলিপি প্রকাশ ১৮৭১), পৃ: ১৪১

[৭] ঐ পৃ: ১৫২

[৮] ঐ পৃ: ১৫২

মুসলমানদেরকে প্রশাসনিক পদ আর ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ হটিয়ে দেয়া হয়। উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন- শোষণের সব চাইতে বেশী শিকার ছিল উপমহাদেশের মুসলমানরা কেননা তারা একই সাথে শোষিত ও নির্যাতিত হয় বৃটিশ ও তাদের দুষ্ট সাঙ্গাত বর্ণ হিন্দুদের নব্য বনিয়াদী শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাজদের দ্বারা।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের যেভাবে পশ্চাৎপদতায় নিমজ্জিত শুরু হয় ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র অভ্যুদয়ের মাধ্যমে তার রাতারাতি অবসান ঘটেনি। অতীতের অনগ্রসরতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্ট জনগণের সামগ্রিকহীনমন্যতাবোধ এর মাঝে দোলায়িত হচ্ছিল দেশটি। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (সিএসপি) একজন খ্যাতিমান কর্মকর্তা এবং বহু বইয়ের লেখক জনাব পিএ নজির তার স্মৃতিচারণে নথিবদ্ধ করেছেন মুসলমানদের হীনমন্যতার একাধিক নজীর। পঞ্চাশ ও ষাট এর দশকে পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে জনাব পিএ নজীর সাধারণ মানুষের সন্নিধ্যে এসে অনেক কিছু অবলোকন ও বাস্তবে বুঝার সুযোগ লাভ করেন। তিনি দেখেছেন যে মুসলমানদের কেহ কেহ হীনমন্যতা থেকে বাঁচার জন্য তথা ভদ্রলোক তথা হিন্দু ভদ্রলোক সাজার জন্য ধূতি পরিধান করতো; যেই ধূতি ছিল বর্ণ হিন্দুদের পরিধান (পিএ নজীর স্মৃতির পাতা থেকে, ১৯৯৩, পৃ: ১০) মুসলমানদের এমন হীনমনতাবোধ অস্বাভাবিক ছিলনা। তথা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত দুই শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে বৃটিশ ও তাদের ভৃত্য বরকান্দাজদের শাসন শোষণ থেকে সৃষ্ট ব্যাপক দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, ক্ষমতা হারানো এবং নিম্নশ্রেণীতে পর্যবসিত হওয়া থেকে এমন বোধের সঞ্চার হওয়া বরং স্বাভাবিক।

মুসলমানদের জাগরণঃ আলীগড় আন্দোলন

স্যার সৈয়দ আহমেদ খান প্রবর্তিত আলীগড় শিক্ষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে স্যার সৈয়দ আমীর আলী ও নবাব আবদুল লতীফ কর্তৃক সংগঠিত প্রায় একই ধরণের আন্দোলন ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের অগ্রগামী হওয়ার সুযোগ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। সে অগ্রগতিতে ছিল খুবই শ্লথগতি আর সারা ভারতে ইতিমধ্যে ইংরেজীতে শিক্ষা লাভকারী বর্ণ হিন্দু শ্রেণীর তুলনায় মুসলমানদের সে অগ্রগতি ছিল নিতান্তই নগণ্য।

উল্লেখ্য যে বাঙালি হিন্দুরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তাদের জ্ঞাতিভাইদের তুলনায় ছিল অনেক অগ্রসর। এরই মধ্যে নতুন ধরণের এক বাংলা ভাষাকে বৃটিশরা পৃষ্টপোষকতা দিলে বাঙালি হিন্দুদের অগ্রগতিতে আর এক মাত্রার সৃষ্টি হয়।

বাংলাভাষার প্রতি বৃটিশদের এই পৃষ্টপোষকতার ফলে তাদের দেশে গড়ে তোলা ইংরেজ ভদ্রলোক শ্রেণীর ন্যায় এখানে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে অভ্যুদয় ঘটে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণী যা স্থানীয়ভাবে বাঙালি বাবু বলে বেশী পরিচিত। এই অবস্থা নতুন ধরণের বাংলাভাষা ভিত্তিক এক বাঙালি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি। দৃশ্যতঃ ধর্ম নিরপেক্ষতার লেবেল-এ উক্ত যে ভাষার কারিক্যুলাম ছিল হিন্দু বিশ্বাস পদ্ধতির অবয়ব থেকেই উৎসারিত। এমনকি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় মডেল অনুকরণে স্থাপিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সনদ ও কার্যক্রম-এ ধর্মনিরপেক্ষ নীতি আদর্শের কথা থাকলেও কারিক্যুলাম ছিল তার চাইতে অনেক দূরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মান্ধতা হিন্দু শিক্ষকরা পরিকল্পিতভাবে তাদের ধর্মশাস্ত্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সিলেবাস প্রণয়ন করতো।[৯]

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুল কারিক্যুলামের অবস্থা ভিন্নতর কিছু ছিলনা, বরং প্রতিপাদ্য ইসলামের কাছাকাছিতো নয়ই; ছিল অনেক বেশী হিন্দুত্ববাদী। প্রায় সকল শিক্ষক হিন্দু হওয়ার কারণেই এমন কারিক্যুলাম ও সিলেবাস প্রণীত হয়। হিন্দুরা কিছু কিছু ইংরেজকে সাথে নিয়ে প্রশাসনের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পদসমূহ করায়ত্ব করে ফেলে। এই অবস্থা মুসলিম মানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে। ফলে নিজেদের মূল্যবোধ ও রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মুসলমানরা আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে মুসলমানরা আর এক ধাপ পিছনে পড়ে যায়।

পূর্ব বাংলার মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার আর একটি বড় কারণ হচ্ছে তারাই উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনে সব চাইতে দীর্ঘ সময় তথা ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল অর্থাৎ ১৯০ বছর ধরে উপনিবেশিক শাসন- শোষণে জর্জরিত জাতি। শোষণ উপনিবেশিক নির্যাতনে মুসলমানরা দারিদ্র্যে পর্যবসিত হওয়ার পাশাপাশি অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত এবং মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলায় ভাগ্যবান বর্ণ হিন্দু ও কায়েমী স্বার্থবাজদের দ্বারা সর্বক্ষেত্রে পরাভূত হয়ে পড়ে। আর এই প্রক্রিয়ায় তারা

[৯] মাসিক নতুন সফর, ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃ: ৩১- ৪৩- মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, জৈষ্ঠ্য, ১৩৪৩ বি,এস, মে- জুন ১৯৩৭ সংখ্যা থেকে প্রদত্ত উদ্ধৃতি

তাদের পরিচয়, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি প্রায় হারিয়ে ফেলে। গত শতাব্দীর শুরুতে রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের অভ্যুদয় বিশেষত বাংলার মুসলমানদেরকে তাদের মুসলিম পরিচিতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফল

মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের যৌক্তিক পরিণতিই সামাজিক সংঘাতের কার্যকারণ সৃষ্টি করে; যার পরিব্যপ্তি রাজনৈতিক অঙ্গনে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। ১৮৮৫ সালে সিনিয়ার কর্মকর্তা এলান অক্টাভিয়ান হিউমসহ বৃটিশ আমলাদের প্রবর্তনায় বর্ণ হিন্দুদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যার মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে দুই এলিট চক্রের একটি আনুষ্ঠানিক সংঘের যাত্রা শুরু হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক লক্ষ্য যাকে পর্দার অন্তরালে রাখা হয়, তা ছিল উপমহাদেশে বৃটিশ উপনিবেশবাদী স্বার্থকে চিরস্থায়ী করা আর অন্য উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে অনগ্রসরতায় নিমজ্জিত রাখা। কংগ্রেস এর উদ্দেশ্য মুসলমানরা সঠিকভাবেই অনুধাবন করে বুঝলো যে মুসলমানদের কংগ্রেস-এ যোগ দেয়া হবে অর্থহীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এ, কে ফজলুল হক সহ কিছু মুসলমান নেতা কংগ্রেস-এ যোগ দেন। তবে বেশীর ভাগ মুসলমান নেতারাই নিজেদেরকে কংগ্রেস থেকে দূরে রাখে। আলীগড় শিক্ষা আন্দোলনের খ্যাতিমান নেতা স্যার সৈয়দ আহমেদ খান মুসলমানদের নিজেদেরকে কংগ্রেস থেকে দূরে থাকার জন্যেই হুঁশিয়ার করে দিলেন না; তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পূর্বে মুসলমানদের কোন রাজনৈতিক তৎপরতায় যুক্ত হতেও বারণ করে দিলেন। অনেকেই তার আহবান সাড়া দেন। সারা উপমহাদেশ থেকে মুসলমান ছাত্র আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও একই সাথে ভাল মুসলমান হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে আলীগড় এঙ্গলো- মোহামেডান কলেজ-এ আসতে শুরু করে। স্যার সৈয়দ আহমেদ তার প্রণীত কারিক্যুলামে এমন পরিকল্পনা ও প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছিলেন। উক্ত কলেজ থেকে আধুনিক শিক্ষা লাভ করে প্রশিক্ষিত মুসলিম গ্র্যাজুয়েটরা বের হতে থাকে এবং কলেজেরও সমৃদ্ধি ঘটে এবং পরবর্তীতে যে কলেজ পরিণত হয় আজকের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাঃ উদ্দীপনা ও দিক-নির্দেশ

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পর মুসলমানরা তাদের নিজেদের রাজনৈতিক মঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য জোটবদ্ধ হয়। সে মঞ্চ হচ্ছে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, যার জন্ম লাভ ঘটে তখনকার সময়ের ইসলামিক ভাবধারা ও গুরুত্বের অন্যতম পীঠস্থান ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে ১৯০৬ সালে। সেই সময়টি ছিল বিশেষ তাৎপর্যময়। কেননা ঢাকা তখন কয়েক শতাব্দী পর প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। শুধু তাই নয়, নব গঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকায় তথা ঢাকা কেন্দ্রীক শিক্ষাগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের যে কার্যক্রম শুরু হয় তার মধ্যদিয়ে পূর্ব বাংলা ও আসামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়; যার শুভ ফল মুসলমানরা নিকট ভবিষ্যতেই লাভ করে।

অনেক বেশী সংগঠিত ও শক্তিশালী কংগ্রেস এর পাশাপাশি নব গঠিত মুসলিম লীগ শুরুতে মুসলমানদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ ও মূল্যবোধ রক্ষায় বৃটিশ শাসকদের সাথে দেন-দরবারের মধ্যেই নিজেদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখে। সেই সময়ে ঐ কৌশলই মুসলিম লীগের জন্য দিল যথার্থ; কেননা মুসলমানরা অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সামাজিকভাবে কেবল অনগ্রসরই ছিলনা, তারা ছিল সমগ্র উপমহাদেশে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

এম, কে, গান্ধীর যোগদানঃ কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের রাজনৈতিক ফোরামে পরিণত

এম, কে, গান্ধী বাস করতেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। প্রথমে তিনি সেখানকার একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। পরবর্তীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে স্থানীয় অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকানদের নিয়োগ দেয়ার কাজের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সর্বশেষ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকান শ্রমিকদের একজন নেতা বনে যান। ইতিমধ্যে কংগ্রেস- এর রাজনীতি তীব্রতর রূপ পরিগ্রহ করে। বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষকরা এটা উদঘাটন করেছেন যে কেমন কৌতুলউদ্দীপকভাবে লন্ডন এর গ্রেজ ইন-এ প্রশিক্ষিত ব্যারিষ্টার গান্ধী একজন নিবেদিতপ্রাণ হিন্দু সাধুতে নিজকে পর্যবসিত করেন। তিনি তার পরিচ্ছদ রাতারাতি বদলিয়ে ফেলে উইনষ্টন চার্চিলের যথার্থ বর্ণনা মত একজন নেংটা ফকিরের বেশ ধারণ করেন। একজন দরিদ্র মানুষের ন্যায় খেতে অভ্যস্থ হবার জন্য খাদ্যাভাস পরিবর্তন করেন। কিন্তু তার এই ব্যক্তিগত আচারাদি তেমন ঘৃণ্য

খারাপ কাজ ছিলনা; কিন্তু ঘৃণ্য কাজ ছিল এই গান্ধী কংগ্রেস- এ যোগদান করে দৃশ্যত ধর্মনিরপেক্ষতার লেবাসধারী হলেও কংগ্রেসকে কার্যত একটা হিন্দু সংগঠনের পরিণত করে। গান্ধীর ঐরূপ উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্যের কিয়দাংশের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গক্রমে দেয়া যায়।

১৯২০ সালের শুরুতে ভারতীয় খেলাফত আন্দোলনের পক্ষে কংগ্রেস এর সমর্থন জ্ঞাপনের পিছনে গান্ধীর উদ্দেশ্য ও স্বার্থ কি ছিল তাতে এর কিছু উল্লেখ আছে। ১৯২১ সালের ২১শে অক্টোবর ইয়ং ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত গান্ধীর নিজ স্বাক্ষরযুক্ত বিবৃতিতে গান্ধী স্পষ্টভাবে বলেন, 'আমি দাবী করি যে উভয় খেলাফতের একটি সমধর্মী লক্ষ্য রয়েছে। মাওলানা মোহাম্মদ আলীর রয়েছে তার ধর্মীয় লক্ষ্যবোধ আর খেলাফতের পক্ষে আমার জীবন উৎসর্গ করার লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানের ছুরি থেকে গরুকে নিরাপদ করা যা- আমার ধর্ম।'[১০] এটা এখানে অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে যে, জিন্নাহ মুসলিম নেতা হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীকে খিলাফত আন্দোলনের জন্য সমর্থন করেনি; কেননা জিন্নাহ তখনও ভারতীয় রাজনীতির সাথে ধর্মকে মিশানোর ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট ছিলেন। অথচ গান্ধী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কংগ্রেস এর ঘাড়ে সওয়ার হয়ে হিন্দু আবেগকে সমসাময়িক রাজনীতিতে অতি ধূর্ততার সাথে ব্যবহার করেন।

বস্তুতঃ কংগ্রেস- এর রাজনীতিতে গান্ধীর হস্তক্ষেপ দলটিকে বেশী মাত্রায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে পরিণত করে। কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধীর প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার অশুভ পরিণতিতে ভারতীয় রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। কারণ গান্ধী ১৯০৯ সালে লর্ড মেন্টো ও ১৯১৯ সালে মন্টেগু- চেমস ফোর্ড প্রণীত আইন মোতাবেক ভারতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করা শুরু করেন। গান্ধীর সক্রিয় সাহায্যেই ১৯২৮ সালে মতিলাল নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে রিপোর্ট ২০ বছর ধরে চালু থাকা সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার অবমাননা করা পূর্বক পৃথক নির্বাচনের বদলে রিপোর্টে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়; যার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল বর্ণহিন্দুদের রাজনৈতিক অবস্থান ও মর্যাদা রক্ষা করা। অন্যদিকে মুসলমানদের নূন্যতম অধিকারের অবস্থান ধ্বংস করা।

[১০]এইচ,এম, সীরভাই, পার্টিশান অব ইন্ডিয়া, লিজেন্ড এন্ড রিয়ালিটি, ইম্মেনেম পাবলিকেশানস, বোম্বে, ১৯৮৯, পৃ: ১৩

হরিজন সম্প্রদায় তথা নিম্নবর্ণের অচ্ছ্যুত হিন্দুদের জন্য গান্ধীর তথাকথিত সহানুভূতি বা দরদ ছিল স্রেফ একধরণের ধাপ্পাবাজি। নেহেরু রিপোর্ট ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের কংগ্রেস থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং প্রকারান্তরে কংগ্রেস এর সাথে তাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। নেহেরু রিপোর্ট প্রণয়নের পর পরই জিন্নাহ নিতান্তই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছিলেনঃ 'এটা বিভাজনের রাস্তা তৈরী করে দিলো।' [১১]

জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগের পিছনে মুসলমানদের সংঘবদ্ধতা

উক্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য তাদের অঙ্গীকার নবায়নের লক্ষ্যে মুসলিম লীগের ব্যানারে সংঘবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে বিংশ শতাব্দীর ভারতের হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বহুল পরিচিত জিন্নাহ কংগ্রেস দল থেকে নিজকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেন; এমনকি ভারতীয় রাজনীতি থেকেও দূরে সরে গিয়ে লন্ডনে অস্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। অবশ্য পরে তিনি ভারতে প্রতাবর্তন করে ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের সুস্পষ্ট মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি রক্ষায় সুদৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কোন অবস্থাতেই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমুদ্রে মুসলমানদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বিলীন হতে দিতে এতটুকুও চাননি। যদিও বৈদিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের দাবীদার স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা ততদিনে সকল অ-ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি গিলে খেয়ে তাদের উদরপূর্তি করে ফেলেছিলো। কেবলমাত্র মুসলমান ও মুসলমানদের সংস্কৃতিই ছিল তার মধ্যে ব্যতিক্রম। উন্নততর মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও সংস্কৃতির অধিকারী মুসলমানরা উপমহাদেশে সুস্পষ্টভাবে ভিন্নতর ও গর্বিত জনগোষ্ঠী হিসেবেই কেবল নিজেদের টিকিয়ে রাখেনি; তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উন্নত খাদ্য তৈরী, উন্নত পোশাক তৈরীর প্রযুক্তিজ্ঞান, উন্নত পোশাক পরিধানের অভ্যাস, নতুন ধরণের গৃহ ও স্থাপনা নিমার্ণ, সেনিটেশান, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সহ বহু কিছু শিখিয়েছে; যা পরবর্তীতে পশ্চিম ভারতের বহু উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও গ্রহণ, অনুসরণ করে ও ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নেহেরু পরিবার অত্যন্ত গর্বের সাথে কেবল মুসলমানদের খাদ্যাভাসই নয়; বেশ- ভূষাও গ্রহণ এবং ব্যবহার করে - এই অজুহাতে যে নেহেরুরা ছিল মোগল

[১১] ঐ পৃ: ১৫

শাসক ফাররুখ শিয়রের সময়কার একটি আধুনিক মুসলিম জায়গীরদারের বংশধর।

জিন্নাহ তার দক্ষতা দিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি পৃথক জাতি হিসেবে মুসলমানদেরও সুদৃঢ় অবস্থান প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানরা যথার্থভাবেই জিন্নাহর আহবানে সাড়া দিয়ে তার পিছনে সবাই কাতারবদ্ধ হন। এই প্রক্রিয়ায় জিন্নাহর যথাযথ শ্রমের ফলে মাত্র দু' বছরের ব্যবধানে ১৯৩৭ সনের নির্বাচনে মুসলমানদের প্রথম বিজয় অর্জিত হয়। মুসলমানদের এই অবস্থা আরো সুসংহত হয় যখন সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রী পরিষদ গঠন করার পর কংগ্রেস এর মুসলমান বিরোধী তিক্ত প্রচারণা তুঙ্গে পৌঁছে। উপমহাদেশের মুসলমানরা কংগ্রেস শাসন এর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে।

মুসলমান ছেলে- মেয়েদের স্কুল কলেজে বাংলার এক দুষ্ট সাম্প্রদায়িক কবি বঙ্কিমের রচিত বহু দেবত্ববাদী বন্দে মাতরম সঙ্গীত কণ্ঠস্থ করতে হতো যা তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের পরিপন্থী। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস যে আজকের বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতও বন্দে মাতরম- এর আর একটি সংস্করণ যার প্রতিপাদ্য হচ্ছে জগতের স্রষ্টার বদলে কেবল মাতৃভূমির বন্দনা করা। কংগ্রেস সরকার সমূহ এতেও ক্ষান্ত হয়নি। তারা হিন্দুদের সাথে স্কুলের মুসলমান ছাত্রদেরকেও গান্ধীর প্রতিকৃতিতে প্রণাম করতে নির্দেশ দেয় যা গান্ধীকে পুজারই নামান্তর, - যা করতে মুসলমান ছেলে- মেয়েরা অস্বীকৃতি জানায় যেহেতু তা ছিল তাদের ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী। সর্বোপরী যে যে প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করে সে সব প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী ভবনে কংগ্রেস এর দলীয় পতাকা উড্ডয়ন করা হয়।[১২]

ঐতিহাসিক আর, কুপল্যান্ড তার ভারতীয় রাজনীতিঃ ১৯৩৬- ৪২ শীর্ষক বইয়ে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর মুসলমানদের শাসরুদ্ধকর নিদারণ দুরাবস্থার কিছু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সন্নিবেশন করেন। তিনি তার বইয়ে লিখেছেনঃ 'গ্রামাঞ্চলে গো জবাই নিষিদ্ধ করা হয়, - যা ছিল সেখানকার চিরদিনকার প্রথা। মুসলমান কসাইদের হিন্দুরা যততত্র মারধর করতো। মসজিদ

[১২]কে, কে, আজিজ, মুসলিমস আন্ডার দি কংগ্রেস রুল, ১৯৩৭- ১৯৩৯: এ ডক্যুমেন্টারী রেকর্ডস, ভল্যুয়েম- ২, ফ্রেন্ডস বুক হাউস, করাচী, ১৯৭৯, পৃ: ৪৩

সমূহে শুকর ছেড়ে দেয়া হতো। মুসলমানদের নামাজে আহবানসূচক আযান দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয় কিংবা বাধাগ্রস্ত করা হয়, মুসলমানদের দোকান পাট থেকে হিন্দুরা কেনাকাটা বন্ধ করে দেয়। গ্রামের পানির কুপ থেকে পানি ব্যবহারে মুসলমানদের বাধাগ্রস্ত করা হয়। বয়স এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে মুসলমানদের উপর যততত্র হামলা চালানো শুরু হয়।[১৩]

এই ছিল কংগ্রেস শাসিত সাতটি প্রদেশে হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদের নির্যাতনের সামান্য চালচিত্র। এই অবস্থা বিশ্লেষণ করলে যে কারুরই এটা অনুধাবন করার কথা যে বৃটিশরা যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে ভারতের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে যেতো তাহলে সমগ্র ভারতে মুসলমানদের অবস্থা কি দাঁড়াতো! সৌভাগ্যবশতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভীতি ও হতাশার প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। মুসলিম লীগ কংগ্রেস মন্ত্রীসভা সমুহের পতনে আনন্দিত হয় এবং ১৯৩৯ সালের ২২ ডিসেম্বর দিকে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পতনের দিনকে নাজাত দিবস হিসেবে ঘোষণা ও পালন করে।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভার ব্যার্থতা মুসলমানদের ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে এবং তারা তাদের পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব উচ্ছকিত করা পূর্বক নিজস্ব মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি রক্ষায় পৃথক রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে থাকে।

লাহোর প্রস্তাবঃ মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংঘাতের পরিণতি

১৯৪০ সালের ২৩ ও ২৪ শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে গৃহীত হয় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব যা পরবর্তীতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

পৃথক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে নিজস্ব স্বকীয়তা ও মুসলিম মূল্যবোধ রক্ষার প্রত্যয়ে ভারতের মুসলমানরা ১৯৪৭ সালে নিজেদের পৃথক আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে উল্লেখের দাবী রাখে যে, তদানীন্তন ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের চাইতে বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তান আন্দোলনে ছিল বেশী অগ্রগামী, যার দরুণ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলার ৯৭ শতাংশ মুসলমান ভোটার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে রায় প্রদান করে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানরা একইভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তাদের সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতি

[১৩] জামিল ওয়াস্তী, মাই রেমিনিসেন্সেস অব চৌধুরী রহমত আলী, এশিয়া প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, করাচী, ১৯৮২ (প্রথম সংস্করণ) পৃ: ১০৫

মুসলমানদের এই সমর্থন অহেতুক ছিলনা। ঐসব অঞ্চলে মুসলমানরা তাদের প্রতিবেশী বর্ণ হিন্দুদের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হতো। উল্লেখ্য যে বৃটিশ শাসনের সুবাদেই তাদের এলাকার বর্ণ হিন্দুদের ভাগ্যের চাকা খুলে গিয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে কর্তৃক বৃটিশ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা ও আবুল হাশিম, শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ও শরৎ বোস উদ্ভাবিত স্বাধীন যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রতি শুরুতে জিন্নাহর আপোষমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বটে; কিন্তু তার মধ্যে এটা ধারণা করার কোনই অবকাশ নেই যে জিন্নাহ মুসলমানদের স্বতন্ত্র মূল্যবোধ প্রথা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন প্লান মোতাবেক ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম জোন ছিল স্পষ্টতই মুসলিম প্রধান এলাকা আর মধ্যাঞ্চল ছিল হিন্দু প্রধান এলাকা। আর মিশন প্লান বাস্তবায়িত হলে মুসলিম প্রধান এলাকাসমূহের স্বশাসন এবং স্বায়ত্বশাসনে স্পষ্টতই মুসলিম সাংস্কৃতিক স্বাধীকারই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠতো। সমভাবে বৃহৎ বাংলার ধারণাও বিকশিত হতো; যেহেতু সেই ব্যবস্থাতেও মুসলিম মূল্যবোধ ও রাজনীতি পরিস্ফুট হবার সম্ভাবনা ছিল। এটা রেকর্ড- এ আছে যে এক পর্যায়ে জিন্নাহ এই মর্মে মন্তব্য করেছিলেন যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন দেশ বৃহৎ বাংলা ভবিষ্যতে পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ পাকিস্তানের সাথে অবশ্যই সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে। জিন্নাহ'র এতদসংক্রান্ত প্রকৃত বাক্যটি ঐতিহাসিক হডসন তার বইতে উল্লেখ করেছেন। 'তারা (পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা) অবিভক্ত ও স্বাধীন থাকাই উত্তম। আমি নিশ্চিত যে তারা পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবে।' [১৪]

কিন্তু নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস বাংলাকে যেকোনভাবে হোক বিভক্ত করার জন্যে গোঁ ধরলো। বস্তুতঃ নেহেরু উদ্দেশ্য অন্য কিছু ছিলনা; সে বাংলাকে বিভক্ত করতে উঠে পড়ে লাগলো এই কারণে যে ভারত বিভাগের পর পূর্ব বাংলা ভারতের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। কেননা তার বিশ্বাস ছিল দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট নানাবিধ পরিস্থিতিতে বছর কয়েকের মধ্যেই পূর্ব বাংলা ভারতের সাথে মিশে যাবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে।[১৫]

[১৪] এইচ, ভি, হর্ডসন, দি গ্রেট ডিভাইডঃ বৃটেন- ইন্ডিয়া- পাকিস্তান, হাটচিনসন, লন্ডন, ১৯৬৯ পৃ: ২৪৬

[১৫] ঐ পৃ: ২৭৬

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাঃ মুল্যবোধ ও স্বার্থ সংঘাতের আর এক পরিণতি

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে চল্লিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহ কত দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়েছে তা যে কেউই সম্ভবত অনুমান করতে পারবে। বস্তুতঃ পুরোপুরিভাবে লাহোর প্রস্তাব কিংবা বৃহত্তর বাংলার ধারণা কিংবা কেবিনেট মিশন প্ল্যান কোনটাই গৃহীত হয়নি; তবে চূড়ান্ত ফল ছিল একক ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে পাকিস্তানের অভ্যুদয়।

১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করে সেই সময়কার বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক আর ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সাংসদদের সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেই সময়কার বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী আর দুই অধিবেশনেই সভাপতিত্ব করেন মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। উভয় প্রস্তাবই ছিল এক ও অভিন্ন পাকিস্তানের প্রস্তাব, যার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিলনা (বেগম শায়েস্তা এস, ইকরামউল্ল্যাহ ১৯৯১ পৃ: ১৩০- ৩১)। মাঝে এক হাজার মাইলের দুস্তর ব্যবধান নিয়ে অবশেষে বৃটিশ ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তের দুই ভূখন্ড নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান। মাঝখানে থেকে যায় শত্রুভাবাপন্ন ভারত। এক ব্যতিক্রমধর্মী ভৌগলিক অবয়ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানকে থেকে শুরু থেকেই ভারতের সব ধরণের শত্রুতাকে সামলাতে হয় এবং নিয়মিত বিরতিতে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের মোকাবেলা করতে হয়। এতদসত্ত্বেও ভারতের সাথে তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট দেশ এবং দুই খন্ডে অদ্ভূত এক ভৌগলিক অবয়বে জন্ম নেয়া পাকিস্তান প্রায় সিকি শতাব্দী ব্যাপী এক ও একটি সুসংহত রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকে। শুধু তাই নয়; এই সময়ের মধ্যে স্বাধীন ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের দুই অংশের উন্নয়ন ছিল দর্শনীয়। যেখানে পাকিস্তানের শুরুতে বলতে গেলে কিছুই ছিলনা; সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জীবনের মান উন্নয়ন ছিল চল্লিশের দশকের দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থার চাইতে অনেক উন্নত; যে চল্লিশের দশকের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে (১৯৪৩- ৪৪) বাংলায় ৫০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল।

তবে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যকার দ্রুত উন্নয়নকে ঘিরে পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণীর মানুষ ভুল বুঝতে শুরু করে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চলের উন্নয়নের তুলনা করতে থাকে। এই ভুল বুঝার কারণ ছিল অংশত জ্ঞানের স্বল্পতা কিংবা শুন্যতা আর

অংশত ছিল পাকিস্তানের কোন কোন এলাকায় উন্নয়নের গতি বেশী মাত্রায় লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠায়।

এই প্রসঙ্গে মরহুম প্রফেসার ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন মুখে শুনা একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। মরহুম প্রফেসার সাজ্জাদ হোসেন ১৯৪০ এর দশকে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের শিক্ষক থাকাকালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব তার ছাত্র ছিলেন। ১৯৫০ সনের মাঝামাঝি সময়ে তখনকার পাকিস্তানের রাজধানী করাচীর শহর কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ইংরেজীর শিক্ষক ডঃ সাজ্জাদ হোসেনের সাথে শেখ মজিবের সাক্ষাত হলে তিনি সাজ্জাদ সাহেবকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে করাচীর সুন্দর সুন্দর সড়ক ও ভবনসমূহ পূর্ব পাকিস্তানের পাট বিদেশে রপ্তানী করে অর্জিত আয় থেকে নির্মিত হয়েছে। ইতিহাস সম্পর্কে ন্যুনতম জ্ঞান বা ধারণা যাদের আছে তারা জানেন যে করাচীর উন্নয়ন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে নয়; বহু আগ থেকেই এমনকি উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন শুরু হবারও আগ থেকে এতদঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন বন্দর নগরী হিসেবে করাচীর উন্নয়ন ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাঃ মুল্যবোধ ও স্বার্থ সংঘাতের আর একটি পরিণতি

পূব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ১৯৪৭ সালের অনতিকাল পরেই সীমান্তের ওপারের পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে অনেক বেশী স্বচ্ছলতা লাভ করেন তাদের মধ্যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ না থাকার বেদনার অভিযোগ থেকে এক ধরণের ক্ষোভের উদ্ভব ঘটে। এই ক্ষোভকে রাজনৈতিক আন্দোলনে বিকশিত করা হয় যার ফল ঘটে ১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফলে এবং যা প্রকারান্তরে ১৯৭১ সালের গৃহযুদ্ধে পর্যবসিত হয়। সেই গৃহযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, গণতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন, উন্নততর অর্থনৈতিক অবস্থা কায়েমের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠা অথবা কারো মতে অর্থনৈতিক ন্যায়ানুগতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের ভাগ্যন্নোয়ন প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে অথবা দিল্লীর নিকট পূর্ব পাকিস্তানের আত্মসমর্পনের পর থেকে আজ অবধি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশিত ভাগ্যন্নোয়ন ঘটেনি। আসলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিবুর্দ্ধিতা, বিভিন্ন ইস্যুকে উঠিয়ে স্বল্প সংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদীর মজা লুটা এবং সর্বোপরী ১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারতের

মারাত্মক অনিষ্টকর অভিপ্রায় -যা হিন্দু ও ইহুদীদের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের দ্বারা লালিত ছিল; এই সব কিছুর সম্মিলিত অপপ্রয়াস ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের পতন ডেকে আনে। ১৬ ডিসেম্বরের পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বেদনাত্মক বিস্ময়ে মুষড়ে পড়ে। পূব পাকিস্তানে ভারতের অধিপত্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনগণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল এ,কে, নিয়াজীর আত্মসমর্পনের পর থেকেই প্রতিরোধ শুরু করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী ১৯৭১ সালের সংঘাতকালীন সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে অপদস্থ হয়ে বিজয় ও পরাজয়ের পূর্ব পরিকল্পিত নাটকের অংশ হিসেবে তথাকথিত আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া প্রত্যাখান করায় ভারতীয় জেনারেল আরোরা বিজয়ী বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে অভিষিক্ত হোন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ২০০ মাইল দূরে সিলেটের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওসমানীর অবস্থানের কারণ ছিল ওটাই। তার অনুপস্থিতি সঙ্গত কারণেই একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যার অর্থ ছিল জবরদখল হওয়া পূর্ব পাকিস্তান ভূখন্ড আইনানুগভাবে বিজয়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকটই আত্মসমর্পন করে। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভাগ্য সেই মুহুর্ত থেকেই দিল্লীর নিকট বন্ধক হয়ে যায়। পরবর্তীতে অবশ্য আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহৃত হলেও গর্বিত বিজয়ী বেসামরিক জেনারেল ইন্ধিরা গান্ধী ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ঢাকা সফরে এসে এমন এক চুক্তিপত্র শেখ মজিবুর রহমানকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়; যার সুবাদে বাংলাদেশের উপর ভারতের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সর্বধরণের আগ্রাসন এস্তেমাল করার অধিকার লাভ করে ভারত। ফলে কেবল শ্রুতিমধুর স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তবে ভারতের একটি করদ রাজ্যে পর্যবসিত হয়। ভারতের অসৎ অভিপ্রায়- এর বিকাশ সাধন ও অসহায়ের মত তা তোষণ করতে দিল্লীর পুতুল ও শো বয় এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় শেখ মুজিব যে সম্পর্কে শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী বহু পূর্বেই ভবিষ্যতবানী করেছিলেন। ১৯৬২ সালে কারারদ্ধ থাকাকালীন সময়ে করাচীর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে লেখা এক চিঠিতে শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী বলেছিলেন আমার নিকট পাকিস্তান এক ও অবিভাজ্য- - - পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলে সামান্য পুলিশী এ্যাকশনেই পরাভূত ও ধ্বংস হয়ে যাবার ভয়াবহ বিপদে নিপতিত হবে (বিএসএস ইকরাম উল্লাহ'র বই পৃ : ১৭৩)। দিল্লীর পুতুল মজিব ও তার ভুঁইফেড় ধনী রাজনৈতিক সাঙ্গাত, যারা নিঃস্ব ও দরিদ্র অবস্থা থেকে জাতীয় সম্পদ লুট, দেশপ্রেমিকদের দল ও তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস লেলিয়ে দিয়ে এবং পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী মানুষের

সহায়- সম্পত্তি লুটপাট করে রাতারাতি নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলে। দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ও দল সমূহের অপরাধ ছিল তারা বৈদিক পুরনো ভারতীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির নিকট তাদের নিজেদের মহৎ মুসলমানী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে চায়নি।

ভারতীয়করণের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীদের প্রতিরোধ

দেশপ্রেমিকদের ভোগান্তি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও সন্দেহ নেই যে তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী অব্যর্থভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এই অব্যাহত প্রতিরোধ কেবল আভ্যন্তরীনভাবেই নয়; দেশের বাইরেও এমনকি ১৯৭১ সালের প্রথম দিকেই লন্ডনে গড়ে উঠে। দেশের ভিতরে ভারতীয় প্রভূত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত পরিণতি তথা ঢাকা পতনের পর পরই শুরু হয়। সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন দিন কয়েকের মধ্যেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া মেজর জলিল তার বন্দুক ভারতের দিকে তাক করে। এটা এমনিতেই ঘটেনি। বিজয়ী ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন বাংলাদেশে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র থেকে শুরু করে অস্ত্র সস্ত্র, মেশিন পত্রাদি, গাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যাপকভাবে লুটতরাজ শুরু করে তখনই মেজর জলিল তা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যায়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর লুটপাট প্রতিরোধ করার অপরাধে মেজর জলিলকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ড থেকে সরিয়ে তাকে গ্রেফতার ও অন্তরীন করা হয় এবং জেল থেকে তার ছাড়া পাবার পরও বহুবার তাকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। অন্যান্য কিছু দেশপ্রেমিক শক্তি গোপন তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ পাকিস্তান পতনের প্রথম বার্ষিকীতেই সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি ১৬ ডিসেম্বরকে কালো দিবস অভিহিত করে ঢাকা সহ দেশের সর্বত্র সাফল্যের সাথে অর্ধ দিবস হরতাল পালন করে। অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তিও বিশেষত আবদুল মতিনের নেতৃত্বে এক গ্রুপ, আবদুল হকের নেতৃত্বে আর এক গ্রুপ আবার তোহার নেতৃত্বেও একটি গ্রুপ ভারতীয় অধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরা সবাই বাম দেশপ্রেমিক শক্তি বলে পরিচিত হলেও এই অবস্থান তারা স্পষ্টতই গ্রহণ করে এই কারণে যে বাংলাদেশ কেবল ভারতীয় প্রভূত্বেরই শিকার নয়, বাংলাদেশী জনগণের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ভারতের অমানবিক ব্রাহ্মণ্যবাদের হুমকিরও শিকার বটে।

ভারতীয়করণের বিরুদ্ধে লন্ডনে দেশপ্রেমিকদের তৎপরতা

ভারতের আধিপত্য থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য লন্ডনেও বেশ কয়েকটি দেশপ্রেমিক গ্রুপ তৎপর হয়। লন্ডনে প্রবাসী পাবনার চান্দাইকোনার ব্যারিষ্টার আলী মোহাম্মদ আব্বাসের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ প্রবাসী সরকার গঠণ করে।[১৬]

আর একটি গ্রুপ কুমিল্লার নবীনগরের মরহুম ডঃ মতিউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয়। তার সাথে তার বন্ধু নঈম হাসান সহ অনেকেই ছিলেন এবং তারা বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পূর্বক তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে লিফলেট, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশনার মাধ্যমে তুলে ধরে। তাদের 'দি স্ক্যানার' নামে একটি পাক্ষিক, সাপ্তাহিক আওয়াজ, সাপ্তাহিক নিশা, মাসিক মনিটর ইত্যাদি প্রকাশনা ছিল। এছাড়াও অন্যান্য কিছু কিছু গ্রুপও ছিল যারা অন্যান্য ফোরামে কাজ করতো।

পূর্ব বাংলার আজাদী আন্দোলন বলে দেশপ্রেমিকদের একটি সংগঠন গড়ে তোলেন জনাব চৌধূরী মঈন উদ্দিন। তিনি 'বাংলার কথা' বলে একটি সাময়িকীও প্রকাশ করতেন। শেখ মজিব সরকারের একছত্র, অত্যাচারী ও নৃশংস ফ্যাসিষ্ট শাসন সত্ত্বেও দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে ভারতীয় অধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন চলতে থাকে।

দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতিরোধ রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের পাশাপাশি মুসলিম মূল্যবোধ, প্রথা- পদ্ধতি ও স্বাতন্ত্র্য ভিত্তিক সংস্কৃতি রক্ষায় সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে; যা মুজিব তার ভারতীয় প্রভূদের পৃষ্টপোষকতা ও সমর্থনে দেশ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে চেয়েছিলো। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে পতন হওয়ার আগ পর্যন্ত জনগণ প্রত্যক্ষ করলো মুজিবের সাড়ে তিন বছরের দুঃশাসনে দেশকে অনৈসলামিকীকরণের অপচেষ্টা আর তাদের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজকে পদদলিতকরণ। ইসলামের বিভিন্ন দিক- এর প্রতি মুজিবের খড়গহস্ত কামাল আতার্তুককেও হার মানায়। সব সরকারী, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ইসলামী ভাবধারাপ্রসুত প্রতীক ও মনোগ্রাম বদলিয়ে তদস্থলে হিন্দু ধর্মীয় ভাবধারার প্রতীক ও মনোগ্রাম প্রতিস্থাপন করা হয়। সরকারী মিডিয়া এবং অনুষ্ঠানসমূহে কোরান তেলাওয়াতের রেওয়াজ বিলুপ্ত করা হয়। শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতীক- মনোগ্রাম থেকে কোরানের আয়াত মুছে ফেলে

[১৬] এম, ওয়াই, আখতার, আলী মোহাম্মদ আব্বাসঃ এ গ্রেট সন অব পাকিস্তান, পাকিস্তান হাউস, ৩৩, টেভিসটক স্কয়ার, লন্ডন, ১৯৭৯ ; মাসিক আল- হিলাল, লন্ডন, ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সংখ্যা সমূহ

সেখানে এমন সব বাক্য ও মূলমন্ত্র লাগানো হয় যার সাথে কোরানের আয়াতের কোন তুলনাই হয়না। আমি দৃষ্টান্ত সহকারে পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার বজ্র আটুনিতে মুজিব ভারতের প্রচারণায় ইসলামের বিরুদ্ধে নানাবিধভাবে খড়গহস্ত হয়েছিলো। প্রতিরোধ এবং আভ্যন্তরীন জনমতের চাপে এক পর্যায়ে বাংলাদেশ রেডিও ও টেলিভিশনে কোরান তেলওয়াত শুরু করা হলেও ধর্মনিরপেক্ষতার আর এক সংস্করণ মোতাবেক কোরান পাঠের সাথে সাথে হিন্দু সহ অন্যান্য ধর্মান্ধবলম্বীদের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করাও চালু করা হয়। ১৯৭১-উত্তর সরকার বাংলাদেশে মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়; কিন্তু তীব্র জনমতের চাপে তারা তা করতে সমর্থ হয়নি। ভারতকে পুনরায় একত্রীকরণ তথা অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনগণের ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারত তার কৌশল বদলিয়ে ফেলে এবং বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে বিশেষত শিক্ষা কারিক্যুলাম, মিডিয়া, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনে নাক গলানো ও হস্তক্ষেপ করে। এই হস্তক্ষেপ-এর ধরণ ও প্রকৃতি এত ব্যাপক যে আমার পক্ষে তার পূর্ণ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। তবে এত এইটুকু জোরের সাথেই বলা যায় যে, পরিকল্পিতভাবে ভারতীয়করণের জন্য যে অপপ্রয়াস অব্যাহতভাবে চলছে এই যাবতকালের সকল সরকারই তা অনুসরণ করে আসছে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তিরা এই প্রক্রিয়ার ভবিষ্যত পরিণতি সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পারেন কিনা এটা অবশ্য ভিন্ন কথা। আর এই পরিকল্পিত ভারতীয়করণের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের স্বাধীনতা ও এখতিয়ার তাদের রয়েছে কিনা এটাও বলা দুস্কর।

ভারতীয়করণের গতি-প্রকৃতি

এটা সর্বজনবিদিত যে বাংলাদেশের সংবিধান কেবল দিল্লীর ছাড়পত্রই নয়, দিল্লীর অনুমোদন নিয়েই প্রণীত হয়। একই ব্যবস্থাধীনে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল ও কমপদ্ধতি প্রণীত হয় ভারতীয় অর্থনীতির পরিপূরুক হিসেবে -যাতে করে উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থ পেতে দিল্লীর করুনা লাত করা যায়। ১৯৭১ সনের পর পরই সেই সময়কার বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃ এ, আর, মল্লিক (একজন শিক্ষাবীদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি) শিক্ষানীতি, তার লক্ষ্য, কারিক্যুলাম, প্রশাসনিক রূপরেখা, ইতিহাস, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ধরণ কি হবে তার দিক-নির্দেশ ভারতীয় প্রভূদের নিকট থেকে নেয়ার জন্য তড়িঘড়ি করে কলকাতা ও দিল্লীতে পাড়ি জমান। (এম,আই, চৌধুরী,

জীবন স্মৃতি, ঢাকা, ২০০৬ পৃ: ৬২৫ দ্রষ্টব্য)। উল্লিখিত নীতির লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে তার অর্থনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের নব্য উপনিবেশ হিসেবে তৈরী করা এবং তরুণদের মন-মানসে তা সঠিকভাবে গ্রথিত করা। তথাকথিত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে দিল্লীর নির্দেশেই গৃহীত হয়েছিল; যার প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সমর্থন মোটেও ছিলনা। কেননা এই ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে কোন সমঝোতায় পৌঁছার চেষ্টা করা হয়নি কিংবা অন্ততঃ কোন গণভোট হয়নি। আওয়ামী লীগ পূর্বে তথা ১৯৭০ সনের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে প্রদত্ত তাদের সকল ওয়াদার বরখেলাপ করে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে রাষ্ট্রের প্রশাসন চালানো শুরু করে।

জনগণকে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য কমমূল্যে সরবরাহের ওয়াদা করা হয়েছিল; কিন্তু ১৯৭১ সনের আগের পর মারাত্মকভাবে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। যে জনগণকে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল; বাস্তবে তারা দেখলো আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার-এ তারা পরিণত হয়। মুজিবের বাংলাদেশে জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা অকল্পনীয় বলে প্রতীয়মান হয়।

মুজিব নিজেই তার আত্মীয়-স্বজন ও পান্ডাদের দিয়ে অরাজকতার সৃষ্টি ও তাতে পৃষ্টপোষকতা দান করেন। তার আপন ছেলে শেখ কামাল, ভাগিনা শেখ ফজলুল হক মনি, তার বশংবদ ঢাকার এস,পি মাহবুবের নাম ঢাকা শহরে সন্ত্রাসীদের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় জেনারেল ওভানের তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময়ে গড়ে তোলা শুরু হওয়া অসাংবিধানিক প্যারা মিলিটারী ফোর্স রক্ষীবাহিনী ছিল মুজিবের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। এই রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক শান্তিকামী মানুষের জন্যে এক আতংক হয়ে উঠে। মুজিবের পুত্র কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পেশাজীবি ছাত্রনেতা ছিলেন এবং ছিলেন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক মূর্তিমানআতংক। তার এক ঘনিষ্ঠজন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ড: আবদুল মতিন চৌধুরী। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কামালকে কেউ কিছু বলার সাহস ছিলনা। কামাল ক্যাম্পাসে তার ভোগের জন্য তার পছন্দের সুন্দরী মেয়েদের ক্লাস রুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতো। আমার কলেজ জীবনের এক সাথী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যিনি এখনো জীবিত আছেন, তার এক সুন্দরী বোন সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। তার উপর কামালের চোখ পড়ায় ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে দ্রুত সে

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বন্ধ করে এবং তাড়াতাড়ি এক তরুণের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাঁচার জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়। এটা ছিল ১৯৭৩ সালের প্রথম দিককার ঘটনা। আমি অন্যত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে সংঘটিত এই ধরণের উচ্ছৃংখল ঘটনা সম্পর্কে আলোকপাত করেছি, যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সেই সময়কার ইনচার্জ ড: এম,এ, আজিজ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েন। কামাল ও তার সাঙ্গাতরা মুসলমানদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বিরোধী বহু নেককারজনক কাজের সাথে জড়িত ছিল, যেগুলো সাধারণ মানুষ ভয়ানকভাবে ঘৃণা করতো।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পাশাপাশি স্কুল সমূহের সমাজ বিজ্ঞান কারিক্যুলাম এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যার লক্ষ্য ছিল তরুণ ছেলে- মেয়েদের ব্রেন ওয়াশ করা যাতে করে তারা তাদের ধর্মের একেশ্বরবাদী মূল্যবোধ ভুলে গিয়ে বহু দেবত্ববাদী ভারতীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্থ হয়ে উঠে।

১৯৭২ সালের প্রথম দিকে ভারতীয় আমলা ও পরিকল্পনাবীদ দূর্গা প্রসাদ ধর বাংলাদেশ সরকারকে এই মর্মে নসিহত করে যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে যেন ভারতীয় অর্থনীতির পরিপূরক হিসেবে বিন্যস্ত করা হয়। প্রশাসনের অল্প সংখ্যক দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা যাদের মুখে তালা লাগিয়ে মুজিব সরকার দিল্লীর সকল দিক- নির্দেশ পালনের জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ডিপি ধরের নির্দেশেই সব কিছু করতেন। অথচ বাংলাদেশের যে কোন সৎ ও দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবীদ জানতো যে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারতের পরিপূরক নয়; বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে অর্থনীতি হতে হবে ভারতের সাথে প্রতিযোগিতামূলক - যদি বাংলাদেশ প্রকৃতই আত্ম- সম্মান নিয়ে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাঁচতে চায়।

অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষঃ ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ

প্রশাসন এবং সামগ্রিকভাবে দেশ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে ঝেটিয়ে বিদায় করার অপচেষ্টা থেকে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি মারাত্মকরূপ পরিগ্রহ করে। বিদেশী- সংবাদদাতারা মুজিবকে যথার্থভাবে দুর্নীতির বরপুত্র বলে আখ্যায়িত করে। ১৯৭০ সালের তুলনামূলক স্বাচ্ছন্দ্যের একটি দেশ সাড়ে তিন বছরের দুঃশাসনে ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে নিপতিত হয় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে, যার দরুণ ঐ বছরের আগস্ট থেকে নভেম্বর; এই চার মাসে বেসরকারী হিসাব মতে কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে। অবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে দুর্ভিক্ষে মৃত

ব্যক্তিদের লাশের দাফন বা সৎকারের জন্যে কোন খোজ- খবরও আত্মীয়- স্বজন পর্যন্ত নিতনা।

কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রাস্তা- ঘাট সহ যত্রতত্র পড়ে থাকা লাশ দাফন করতো। দুর্ভিক্ষে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় শহর রংপুরে সব চাইতে বেশী মানুষের মৃত্যু ঘটে। লঙ্গরখানা সমূহে ছিল লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্থ মানুষদের উপছে পড়া ভীড়। যৎসামান্য যে খাবারের আয়োজন লঙ্গরখানা সমূহে করা হতো তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। যখন দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরছিলো তখন আওয়ামী লীগারা ছিল তাদের ভাগ্যগড়ার তুঙ্গে। হাজার হাজার ফেডারেল পাকিস্তানের সমর্থক বাংলাভাষী ও অবাঙালি বিহারীদের হয় হত্যা না হয় জেলে পুরে তাদের সকল সহায় সম্পদ লুট করার পাশাপাশি নানাবিধ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও রিলিফের মালামাল লুট করে তারা ছিল মহা সুখ ও আনন্দে। আর অন্তত সেই সময়ের জন্যে মুসলিম সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে পরাস্ত করে বাঙালি মূল্যবোধের ডংকা বাজছিলো সর্বত্র। ভারতের কংগ্রেসীয় নেতৃত্ব সেটাই বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল যা তাদের পূর্বসূরী হিন্দু নেতারা ১৯৪৭ সালের পূর্বে সমগ্র উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো।

ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনই ছিল সেই সময়কার দুঃশাসন এস্তেমাল করার অন্যতম তরীকা এসন অবস্থার প্রেক্ষাপটেই মুজিব গণতন্ত্রকে হত্যা করে তার নিরঙ্কুশ একনায়কোতান্ত্রিক নেতৃত্বে সোভিয়েট মডেল- এ কায়েম করে এক দলীয় বাকশালী শাসন। স্বৈরশাসক মুজিবের জন্য পার্লামেন্টকে একটি রাবার ষ্ট্যাম্প বানানো হয়। মুজিবের দুঃশাসনের যারা বিরোধীতা করে তাদেরকে কুখ্যাত রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে অবর্ণনীয়ভাবে নির্যাতন করতো এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড চালানো হয় দেদারছে। মাত্র কয়েক মাসে এভাবে প্রায় ২৭০০০ দেশপ্রেমিক তরুণকে হত্যা করা হয়।[১৭] অবস্থা এত ভয়ংকর পর্যায়ে উপনীত হয় যে বাঙালি মূল্যবোধের ধারক- বাহকদের অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা অসম্ভব হয়ে উঠে। এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট প্রতিরোধের বিস্ফোরণ ঘটলো। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের বীরোচিত অভ্যুত্থান মুজিবের একনায়কতান্ত্রিক শাসনকেই কেবল উৎখাত করেনি, বরং দেশ ও জাতির প্রকৃত পরিচয় ও মুসলিম জাতিসত্ত্বার

[১৭] নঈম হাসান, বাংলাদেশ ট্রাজেডীঃ বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে মুজিবের বাংলাদেশ, লন্ডন, ১৯৭৭

দৃঢ়তর পুনরুজ্জীবনও ঘটালো। মুজিবের ঘৃণ্য একনায়কতান্ত্রিক শাসনের যবনিকাপাতে জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। উপরন্ত জনগণ ভারতীয় প্রভাব ও আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার অবারিত সুযোগ লাভ করলো। অভ্যুত্থানের সংগঠকরা খন্দকার মোশতাককে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত করলো। খন্দকার মোশতাক দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পর্যায়ে চালু হওয়া বৈদিক ও ভারতীয় প্রতীক ও তঘমার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং জয়বাংলা শ্লোগান বদলিয়ে মুসলিম প্রথা অনুসৃত বিস্মিল্লাহ, খোদা হাফেজ, আস্সালামু আলাইকুম, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ প্রভৃতি চালু করেন। ৮৩ দিনের মাথায় এক পাল্টা অভ্যুত্থানে মোশতাক অপসারিত হলেও তার প্রবর্তিত প্রতীক ও শ্লোগান পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন হওয়া কোন সরকারের পক্ষেই পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। মুসলিম মূল্যবোধের পরিপন্থী কোন পরিবর্তনই জনগণ মেনে নেবেনা; বরং তারা যে কোন মূল্যে মুসলিম মূল্যবোধ, পরিচয়সূচক স্বাতন্ত্র্যতাকে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধ পরিকর। পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জিয়া ও এরশাদ ইসলামী পরিচয় জ্ঞাপক কিছু কিছু প্রতিপাদ্য সংশোধনপূর্বক সংবিধানে সন্নিবেশিত করেন। সংবিধানের ঐসব পরিবর্তন তাদের জনপ্রিয়তায় অতিরিক্ত মাত্রার সংযোজন করে, যেহেতু জনগণ তা পছন্দ করে। অবশ্য ঐসব পদক্ষেপ স্রেফ তাদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যই নেয়া হয়েছিল; নাকি জনগণের অনুভূতির প্রতি তাদের সততা- শ্রদ্ধাবোধ থেকেই তারা সেটা করেছে - এটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তবে পরবর্তী সরকার সমূহের কেউ ঐ সব পরিবর্তন থেকে সরে আসার সাহস করেনি এই কারণে যে তেমন অবস্থায় জনমত তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তবে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এখনো চলছে। এটা ভবিষ্যতেও চলবে কেননা ভারত ও তাদের এতদ্দেশীয় বশংবদরা দুই মূল্যবোধের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে শানিত রাখতে দেশাভ্যন্তরে ও বাইরে থেকে ভারতের অধিপত্যবাদী কারসাজীতে অব্যাহভাবে তৎপর রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজে অস্থিতিশীলতা এবং অর্থনীতিতে বিপদাপন্ন অবস্থা জিইয়ে রাখতে ভারত অব্যাহতভাবে তৎপর থাকবে বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের বাজার ভারতের দখলে রাখার জন্যে। আওয়ামী লীগের বাঙালি মূল্যবোধের কচকচানি ভারতীয় মূল্যবোধ ও প্রথার জন্য উপযোগী; কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ বা নব্বই শতাংশ মানুষ মূল্যবোধের সাথে তা সামঞ্জস্যস্যপূর্ণ নয়। সে কারণেই সত্তুর দশকের দিকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যথার্থভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখান করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন, যার

ভিত্তি কেবল বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখাই নয়; এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা বস্তুতঃ নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত, যা সহস্র বছর ধরে এই মাটিতে লালিত ও বিকশিত হয়েছে।

বাংলাদেশকে ইসলামিক বলে মানতে ভারত ও তার অনুচরদের অস্বীকৃতি

ভারতীয় শাসকরা বরাবরই এটা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যে, মৌলিকভাবে 'এক ও অভিভাজ্য' ই হচ্ছে উপমহাদেশের সংস্কৃতি -যা প্যাটেল চল্লিশের দশকে বলেছিলেন।[১৮] সত্তুর দশকের বহুল পরিচিত ভারতীয় রাজনীতিবীদ ও লেখক বলরাজ মাধক জোরের সাথে বলেছিলেন যে ভারতের একক এবং প্রধান সংস্কৃতি বৈদিক সূত্র থেকে উৎসারিত যা চার হাজার বছর ধরে অনুসৃত হয়ে আসছে। অন্য যে সব সংস্কৃতির আবির্ভাব দেখা যায় তা নানা ধরণের বিভাজনেরই প্রতিফলন যার সাথে সামগ্রিক ভারতীয় সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক বা তালুকাত নেই।

বলরাজ মাধকের দাবী আংশিক সত্য; কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। উপমহাদেশে মুসলমানদের পূর্বে বৈদিক বিশ্বাস ভিত্তিক সংস্কৃতির আগ্রাসন ও আক্রমণে ব্রাহ্মণ্যবাদ ছাড়া অন্য কোন বিদেশী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ টিকতে পারেনি। একমাত্র ইসলামী মূল্যবোধই সেই বৈদিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সাথে সুদৃঢ় ও সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। অন্য কথায় মুসলমানরা তাদের মূল্যবোধ রক্ষায় সুদৃঢ় থাকার জন্যে ভারতের মাটি তাদের সম্পূর্ণভাবে হজম করতে পারেনি। তারা কেবলমাত্র অপরাপর মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের পাশাপাশি নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যতা নিয়ে টিকেই থাকেনি, মুসলমানরা ইসলামী বিশ্বাসের প্রতি এতদঞ্চলের অপরাপর মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের ইসলামিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, প্রথা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। এই কারণেই বারো শত বছর ধরে মুসলমানরা এক বিশাল জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়; - যা হিন্দুদের চক্ষুশুলে পরিণত হয়। এই সম্পর্কে খ্যাতিমান ইংরেজ ঐতিহাসিক ও চল্লিশের দশকে ইন্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ইয়ান স্মীথ চমৎকারভাবে বলেছেন : 'উপমহাদেশে তাদের বিশাল সংখ্যক অনুসারী থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরা অবশ্যই এটা সম্পূর্ণভাবে জানে যে কেন তারা ইসলামকে ভয় করে। ইসলামে বিশ্বাসীরা এখানে প্রথমে আসে সমুদ্র পথে, পরে আসে ভূভাগ দিয়ে এবং বারো থেকে আঠারো শতাব্দী

[১৮] এম,এ, আজিজ (পূর্বে উদ্ধৃত) পৃ: ৫

ব্যাপী ৫৫০ বছর ধরে পর্যায়ক্রমিকভাবে বেশ কিছু শক্তির পরাজয় ঘটিয়ে, মুসলিম বিজেতারা দিল্লী থেকে বিনাবাধায় একচ্ছত্র প্রভাবে সমগ্র ভারত শাসন করে, ভারত মাতার বিশাল অংশ তাদের দখলে নেয়; যে জায়গাগুলো ছিল হিন্দু ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অবয়ব।[১৯] মুসলমানদের এই বিজয়াভিযান হিন্দুদের মনে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে।'

বস্তুতঃ মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক অবস্থানের এটাই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পটভূমি। উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলামিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে; তবে ব্যাপকভাবে নয়। এটা ঘটে নির্দ্দিষ্ট পরিমন্ডলে। সহস্র বছরের বেশী সময় ধরে মুসলমানদের শাসন চলার পরও তাদের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হয়ে থাকার এটা একটা বড় কারণ। অথচ মধ্যপ্রাচ্য মুসলিম শাসনের ফলে বিভিন্ন বিশ্বাস থেকে গড়ে উঠা সেখানকার প্রায় সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীই মুসলমান হয়ে যায়।

উপমহাদেশে মুসলমানরা বাইরে থেকে এলেও তারা এই মাটিতে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলে এবং স্থায়ী হবার পর তারা কখনও তাদের পূর্ব জায়গায় ফিরে যায়নি। অথচ হিন্দুরা বরাবরই মুসলমানদেরকে বিদেশী ও অনুপ্রবেশকারী বলে গালি দেয়। এই গালিই শেষ নয়; তারা মুসলমানদেরকে ভারত ত্যাগ করা পূর্বক তাদের আদি নিবাস- এ ফিরে যাবার জন্য সর্বদাই হুমকি দিয়ে থাকে। পাশাপাশি হিন্দুদের আর একটি কথা হচ্ছে মুসলমানরা যদি ভারতে থাকতে চায় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই বৈদিক হিন্দু মূল্যবোধ সম্পূর্ণভাবে মানতে হবে এবং পৌরনিক হিন্দুত্ব সংস্কৃতি ভিত্তিক বহুশ্বেরবাদ ও বহুদেবত্ববাদী মূল্যবোধ অনুসরণ করতে হবে।

হিন্দুদের বিশেষত ব্রাহ্মণদের এই অহমবোধ থেকেই তারা মানবতাবাদী বৌদ্ধদের তাদের নিজ ভূমি থেকে শত শত বছর ধরে অমানবিকভাবে নির্মূল করে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলে এবং একইভাবে তারা মুসলমানদেরকেও নির্মূল করতে চায় (ড: এ, মুমিন চৌধুরী, দি রাইজ এন্ড ফল অব বুদ্ধিইজম ইন সাউথ এশিয়া, লীসা, লন্ডন, ২০০৮)। তবে এই কাজটি হিন্দুরা হয়তো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়; তারা এটা করতে চায় অনৈসলামিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে- যা বাংলাদেশ ১৯৭১ সনের সংঘাতের সময় থেকেই ভোগ করে আসছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে মুসলমানরা যে সমাজ বা দেশেরই হোক না

[১৯] ঐ, আয়ান স্টিকেন এর পাকিস্তান বই থেকে উদ্ধৃত পৃ: ২৮- ২৯

কেন; তাদের একেশ্বরবাদী ধর্মীয় বিশ্বাস এতই প্রগাঢ় যে সর্বেশ্বরবাদ বা বহুদেবত্ববাদী কোন কিছুর অনুসরণের কোন প্রশ্নই তাদের জীবনে নেই। এটা তাদের ধর্মবিশ্বাসের মূলমন্ত্র; এমনকি অনেক সময় নিরঙ্কুশভাবে একনায়কতান্ত্রিক ও শাসরুদ্ধকর শাসন ব্যবস্থা সত্ত্বেও এমন কোন পথ বা পন্থার সাথে তারা নিজেদের সম্পৃক্ত করেনা, যা একেশ্বরবাদী ইসলামিক মূল্যবোধ বিরোধী। মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ শক্তির মূলসূত্র এটাই- যা তাদেরকে গত দেড় হাজার বছর ধরে তাদের স্বাতন্ত্র্য মূল্যবোধ নিয়ে টিকিয়ে রেখেছে এবং পৃথিবীর ৫টি মহাদেশে তাদের বিস্তৃত করে আজ পৃথিবীর গোটা জনগোষ্ঠীর প্রায় এক চতুর্থাংশে পরিণত করেছে। তবে এটা সত্যি নয় যে মুসলমানরা স্থানীয় পর্যায়ের সবকিছুই ত্যাগ করেছে অথবা এড়িয়ে গেছে। তবে তারা তাদের ধর্মের একেশ্বরবাদী মূল্যবোধের পরিপন্থী কোন মূল্যবোধ কখনই গ্রহণ করেনি।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে মূল্যবোধের সংঘাত প্রবিষ্ট

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে মূল্যবোধের সংঘাতের রূপরেখা বৃটিশ শাসনামলে অনেক শানিত রূপ ধারণ করে; কেননা বৃটিশরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে ভাল বেতনে সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য পেশায় নিয়োগ প্রদান পূর্বক আর্থিক আনুকল্য দিয়ে হিন্দুদেরকে জাতে উঠায়- যেই সব পদ ও পেশায় মুসলমানরা ছিল হিন্দুদের অনেক পিছনে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ শুরু করায় তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামে অগ্রবর্তী তথা জাতে উঠানো হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিযোগিতায় নামে; বিশেষত বাংলায়- যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় সত্ত্বেও সরকারি চাকুরী ও বিভিন্ন শিক্ষিত পেশায় হিন্দুদের চাইতে অনেক পিছনে ছিল। হিন্দুরা সেই প্রতিযোগিতাকে নিদারুণভাবে ঘৃণা করতে থাকে। ফলে বিভিন্ন স্তরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। চল্লিশের দশকের প্রথমে লিখিত বিভিন্ন লেখায় নিরোদ চৌধুরী এই সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন যা তার প্রকাশিত অনেকগুলো বইয়ের মধ্যে দাই হেন্ড, গ্রেট এনার্কঃ ইন্ডিয়া, ১৯২১- ১৯৫২ শীর্ষক একটি বইতে সন্নিবেশিত হয়েছে। কলকাতা করপোরেশানের একটি সভায় বাংলার মুসলমানদের শ্রদ্ধেয় নেতা খান বাহাদুর আবদুল মমিন কলকাতায় বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য হিন্দুদের অনুরূপ সুযোগ- সুবিধার দাবী জানালে তাকে অত্যন্ত অপমান করে থামিয়ে দেয়া হয়। তিনি সভায় উপস্থিত হিন্দু তরুণ

কাউন্সিলারদের তীব্র ব্যঙ্গ- বিদ্রূপাত্মক কোরাসের মধ্য দিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

নিরোদ চৌধূরী আরো লিখেনঃ 'আমি এক নিবন্ধে মুসলমানদের প্রতি সাধারণ বাঙালি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমার মর্মাহত হবার কথা উল্লেখ করেছি - যা শুধু কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা; এটা ছিল সমগ্র ভারতে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গী - যারা, হিন্দু সমাজের পাশাপাশি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতো এবং এই স্বাতন্ত্র্যকে হিন্দুরা বৈধ বলেই স্বীকার করতোনা।' তিনি তার বইয়ে আরো লিখেছেনঃ 'মুসলমানদের আত্মপরিচয়মূলক সবকিছুই হিন্দুরা আপোষহীনভাবে প্রত্যাখান করতো। এমনকি হিন্দুরা আত্মপরিচয়মূলক, মুসলমানদের জীবনাচারকে জাতি- বিরোধী বলেও ঘোষণা করে।'[২০]

উক্ত মূল্যবোধ ও স্বার্থ সংঘাতেরই পরিণতি হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানদের নিজেদের আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন। হিন্দুরা এই দাবীর প্রতি কেবল বিরক্তিই প্রকাশ করেনি, তারা পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধপ্রবন হয়ে উঠে এবং বিভাজন প্রতিষ্ঠাকে অকার্যকর করার কাজ ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু করে। এই সম্পর্কে বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল স্যার ক্লড আউচিনলেক ১৯৪৭ সালেই প্রণীত তার এক রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, 'এটা নিশ্চিতভাবে বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে জওয়াহেরুল লাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় মন্ত্রী পরিষদ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সকল পথে বাধা সৃষ্টির জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে বদ্ধপরিকর"[২১]

আউচিনলেক এই রিপোর্ট প্রদান করেন যখন তিনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সরঞ্জাম বণ্টনের দায়িত্ব পালনে তার কাজে কংগ্রেস নেতাদের অব্যাহত বাধা প্রদানে অত্যন্ত হতাশ ও মর্মাহত হন। আউচিনলেক তার সর্বোচ্ছ শক্তি দিয়ে পাকিস্তানের জন্য মাত্র ৬০০০ টন সামরিক সরঞ্জাম দিল্লীর নেহেরু সরকারের কবজা থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হোন। অথচ পাকিস্তানের অংশ নির্ধারিত হয়েছিল এক লক্ষ সত্তুর হাজার টন।[২২]

---

[২০] নিরোদ চন্দ্র চৌধুরী, দাই হ্যান্ড, গ্রেট এনার্কঃ ইন্ডিয়া, ১৯২৩- ১৯৫২, চাট্টো এন্ড উইডাস, লন্ডন, ১৯৮৭, পৃ: ৪৬৬- ৬৮

[২১] ল্যারি কলিনস এন্ড ডোমিনিক ল্যাপায়ার, ফ্রীডম এট মিডনাইট, পান্থার বুকস, গ্রানাডা পাবলিশিং লিঃ, ইউ, কে, ১৯৮৪, (পুনঃমুদ্রণ) পৃঃ ৩৪০

[২২] ঐ, পৃ: ৩৪০

তিনি তদানীন্তন এটলীর নেতৃত্বাধীন বৃটিশ সরকারের নিকট উক্ত রিপোর্ট পেশ করেন। আমি এই বইয়ের অন্যত্র পাকিস্তান সৃষ্টির প্রতি ভারতের ঘৃণ্য দৃষ্টিভঙ্গী এবং ১৯৪৭ সালের বিভাজন মুছে পাকিস্তানকে বিলুপ্ত করার ভারতীয় পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছি। অতএব ১৯৭১ সালের বিচ্ছিন্নতাই শেষ নয়; এটা ছিল তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি উপায় মাত্র। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সংক্রান্ত ভারতের প্রতিটি কার্যক্রমের পিছনে মূলতঃ রয়েছে তাদের সেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী।

এটা তাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে, ১৯৪৭ সালের বিভক্তিকে অকার্যকর করার পরিকল্পনা ভারত আজও বাস্তবায়িত করতে পারেনি। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয় আজ যে অবস্থানে রয়েছে তা ৪৭' এর বিভক্তিরই ফল। এই দুই দেশের কেহই ৪৭' এর বিভক্তিকে অকার্যকর করতে চাইবেনা। ভারতের তীব্র চাপ ও মারাত্মক আধিপত্যবাদী কর্মকান্ড এবং সামাজিক- সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহজাত দুর্বলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুসলমানরা কোন অবস্থাতেই ৪৭'এর বিভক্তিকে অকার্যকর করতে চাইবে না। আমি নিশ্চিত যে মুসলমানরা তাদের স্বাধীন সত্ত্বা যে কোন মূল্যে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর এবং কোন অবস্থাতেই তারা নিগৃহীত ভারতীয় বাঙালিত্বে কখনই লীন হয়ে যাবেনা। এই বাস্তবতা সম্পর্কে ১৯৭১ সালের গৃহযুদ্ধ শুরুর পূর্বে সত্তুর দশকের অনেকের মধ্যে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান শ্লোগানের উদগাতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ১৯৭১ সালের পর পরই সৃষ্ট সম্ভাব্য বিপদাপন্ন অবস্থা আঁচ করতে পেরেই তিনি পৃথক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। আজাদ/মুসলিম বাংলা আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। পরবর্তীতে জনাব অলি আহাদও বাংলাদেশে আজাদ বাংলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের অভ্যুত্থানের পর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল কর্মকান্ডের শুরুতে বিস্মিল্লাহর অন্তর্ভূক্তি, পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক ১৯৭৯ সালে সংবিধানের শুরুতে বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম এর সংযোজন এবং এরপর জেনারেল এরশাদ কর্তৃক সংবিধান সংশোধনপূর্বক রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের অন্তর্ভূক্তি দ্বারা বাংলাদেশ এটাই বার বার বুঝাতে এবং পুনঃ নিশ্চয়তা বিধান করতে চেয়েছে যে, বাংলাদেশ কেবল ১৯৪৭ সালের বিভক্তি জোরের সাথেই রক্ষা করবেনা; উপরুন্ত তার মুসলিম পরিচয়ও যে কোন মূল্যে বজায় রাখবে।

এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে ১৯৪৭ সালের পর ভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয়করণ তথা বাস্তবে হিন্দুয়ানীকরণ প্রক্রিয়া ও চাপ ইতিহাসের অন্য সময়ের তুলনায় জোরে শোরেই চালানো হচ্ছে; কেননা ভারতীয় মুসলমানদের অপরাধ হলো তারাও পাকিস্তান আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিল। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সংবিধানে সকল ধর্মের স্বাধীনতার গ্যারেন্টি সন্নিবেশিত থাকা সত্ত্বেও তারা নির্যাতিত হচ্ছে অহরহ। বাংলাদেশ সংবিধানেও সকল ধর্মচর্চার গ্যারেন্টি আছে; কিন্তু বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা কি নির্যাতিত হচ্ছে ? ১৯৪৭ সালের পর শত সহস্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারতে মুসলমানদের কচুকাটা করা হয়েছে। সেখানে মুসলিম বিদ্বেষী ভাব ও উদ্বেগ থেকে প্রতিদিনই ভারতের কোথায়ও না কোথায়ও সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলী ঘটছে এবং এটা ক্রমশই বৃদ্ধিলাভ করছে। ১৯৪৭ সালের পর গত ৫১ বছর ধরে কাশ্মীরের মুসলমানদের অত্যাচার-নির্যাতন, নির্মূল হত্যা, গণহত্যা আজ প্রামাণ্য ইতিহাসের অংশ। ১৯৯২ সালে অযোধ্যায় ৫০০ বছরের পুরনো বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা ইত্যাদিই হচ্ছে মৌলবাদী হিন্দুদের মারাত্মক মুসলিম বিদ্বেষের নজীর। অথচ সৌভাগ্যক্রমে ভারতের অন্তহীন উস্কানী সত্ত্বেও বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে ভারতীয় মডেল এর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তথা হিন্দু বিদ্বেষী কোন দাঙ্গা সংঘটিত হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশকে ভারতীয়করণের জন্য ভারতীয় চর ও ৫ম বাহিনী ভেতর ও বাইরে থেকে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যে দেশে ৯০ শতাংশ জনগণ হচ্ছে মুসলমান তারা কখনও এই চক্রান্তকে সফল হতে দেবেনা। তারা বরং মুসলিম মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে অব্যাহতভাবে চিরদিনের জন্য উচ্ছ্রকিত রাখবে। অর্থনৈতিক দিক-দর্শন, সংস্কৃতি ও জীবনাচারের মধ্যেই টিকে ও সম্পৃক্ত হয়ে উঠতে বদ্ধপরিকর থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় অবশ্য গত সহস্রাব্দে চালু থাকা সংঘাত লক্ষ্যনীয়ভাবে হয়তো অব্যাহত থাকবে; যা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় জারী রয়েছে। তবে মুসলমানরা তথাকথিত অখন্ড ভারতীয় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার যে কোন চক্রান্তের সামনে মাথা নত না করে ইজ্জত ও সম্মানের সাথে টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত যে ভারতের শাসক শ্রেণীর অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরদিনের জন্যই অপূর্ণ থেকে যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় আধিপত্যঃ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের উভয় সংকট

উপমহাদেশের পশ্চিম প্রান্তের দেশ পাকিস্তান এবং পূর্বাঞ্চলীয় দেশ বাংলাদেশ এক হাজার মাইলের দূরত্বে হলেও দুই দেশই তাদের নিজেদের অভিন্ন ও সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র সত্ত্বা উচ্ছকিত রাখার জন্যে উভয়েই অভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে কষ্টকর এক সংগ্রামে পাড়ি দিয়ে চলেছে।

তবে কিছু সন্দেহবাদী রয়েছে যারা উভয় দেশের বহু ক্ষেত্রের অবস্থা যে এক ও অভিন্ন তা মানতে চায়না। এই সন্দেহবাদীরা ভাষাগত প্রভেদ এবং ভৌগলিক অবস্থানের কথা গুরুত্বের সাথে বলে তারা জনগণকে এটা বোঝাতেই সব সময় তৎপর থাকে যে, জাতি, ভাষা ও ভৌগলিক অবস্থার চাইতে কোন কিছু মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ভাষাগত প্রভেদ বা ভৌগলিক বাস্তবতাকে কি বুঝ-জ্ঞানসম্পন্ন কেহই অগ্রাহ্য করতে পারে?

আসলে সন্দেহভাজন কিছু লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই জাতিগত প্রভেদ বা বিভিন্নতার কথা বলে কোন কোন জনসমষ্টির এক ধরণের পৃথক সামাজিক বৈশিষ্ট্য দাঁড় করায়। কিন্তু মানুষের সমাজে সে যেখানকারই হোক ঐসবই কেবলমাত্র বিবেচ্য বা ঐসবই শেষ বিষয়াদি নয়। জাতি এবং জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নে জাতিগত, ভাষাগত এবং ভৌগলিক পরিচিতিকে গণ্য করার একটি ব্যাপার সম্প্রতি ইউরোপে লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠেছে। এটা এক অর্থে বাস্তব; কিন্তু উক্ত ধারণার ভিত্তিতে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়প্রাপ্ত দেশ সমুহের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সে ধারণা ভাল হবার চাইতে খারাপ বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

বস্তুতঃ দুইটি বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীতে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের উৎসে রয়েছে জাতী ও জাতিরাষ্ট্র সম্পর্কিত উক্ত ধারণাসমূহ। শিল্পজাত পণ্যের বাজার দখল করার যে উতুঙ্গ প্রতিযোগিতা দেখা দেয় তা থেকেই উদ্ভূত উপরেউল্লেখিত নিন্দনীয় ধারণা - যা ছিল আমার দেশ- সঠিক কিংবা বেঠিক যাই হোক না কেন দৃষ্টিভঙ্গী; যার মধ্যে মানবিক কল্যাণ কিংবা মানবিক মর্যাদাকে পদদলিত করে শুধু টিকিয়ে থাকার উৎকট প্রবৃত্তি নিহিত আর এর ভয়াবহ কাফফরা গুণতে হয় কম ভাগ্যবান সাধারণ জনগোষ্টীকে।

গত শতকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর সাম্প্রতিক সময়ে খোলাবাজার অর্থনীতি নিয়ে যে দৌড়- ঝাপ- -

তার ঘোষিত লক্ষ্য যদিও হচ্ছে ধনী ও গরীবদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করা; কিন্তু বাস্তব ফলশ্রুতি হচ্ছে গরীব দেশসমূহের গরীবরা যেন গরীবও না থাকতে পারে, তারা যেন সর্বস্বহারা নিঃস্ব-এ পর্যবসিত হয়। এমনিতর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটকে সামগ্রিকভাবে নিজেদের অনুকূলে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে শোষণ এবং এখানে তাদের নব্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় ভারত তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে: যদি সে এই দেশ ও ভূখন্ডকে জুনাগড়, হায়দ্রারাবাদ, কাশ্মীর ও সিকিমের মত গ্রাস না করে। এমনিতর আশংকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যদি ভাষা বিষয়ক উন্মাদনাকে জিইয়ে রাখে তাহলে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ভারতের আধিপত্যবাদী তৎপরতা বাড়তে থাকবে, কমবে না।

ইতিহাসে এটা স্পষ্ট যে মুসলমানরা কখনও কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষা ও ভৌগলিক পরিমন্ডলে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি। জাত প্রথা, - যা কাকেও সম্ভ্রান্ত ও আবার কাকেও অচ্ছ্যুৎ হীনমন্য বলে চিহ্নিত করে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর উপর উচ্চবর্ণ বলে দাবীদারদের শোষণ ও খবরদারী ইসলামী দর্শন ও বিশ্বাস মতে নিতান্তই ঘৃণ্য ব্যাপার। বৈদিক ভারতীয়দের মত মুসলমানরা কখনও নিজেদের বিশেষ কোন এলাকা কিংবা কেবল একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখেনি। কেবল অর্থনৈতিক কারণে কোন এলাকায় নিবাস গড়ে কিংবা স্থায়ীভাবে বসবাস না করে জাত, ধর্ম, বর্ণ ও ভূখন্ড নির্বিশেষে সর্বত্র মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার বাণী নিয়ে চষে বেড়ানোর ব্যাপারটাই কোরানে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই কারণেই ইতিহাসে দেখা যায় যে, মুসলমানরা সুদূর আরব ভূমি থেকে দলে দলে বের হয়ে আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্য চষে বেড়িয়েছে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে যা বর্তমানে পাকিস্তান সেখানে মুসলমানদের পদচারণা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকেই শুরু হয় এবং প্রায় একই সময়ে পূর্ব ভারত তথা বর্তমান বাংলাদেশেও মুসলমানদের আগমণ ঘটে। পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটে বিজয়ী শক্তি হিসেবে আর পূর্বাঞ্চলে মুসলমানরা প্রথমে আসে ধর্ম প্রচারক হিসেবে এবং পরবর্তীতে আবির্ভূত হয় যুদ্ধে বিজয়ী শক্তি হিসেবে।

শুরুতে মুসলমানদেরকে বৈরী অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়েছে কেবল অজানা অঞ্চলে বসত গড়ে তোলার ক্ষেত্রেই নয়, এই বৈরীতা মোকাবেলা করতে হয়েছে আরবীয় আদর্শের আলোকে ইসলামিক সামাজিক জীবন অনুসরণে এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবজায় রেখে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায়। কেননা মুসলমানদের অনুসৃত তৌহিদ (আল্লাহর প্রতি একনিষ্ট বিশ্বাস) এবং রিসালাত (মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনাচার-এর তত্ত্ব ও দর্শন) বিশাল ভারতীয় বিধর্মী

জনগোষ্ঠীর নিকট ছিল সম্পূর্ণ অজানা। তবে সৌভাগ্যক্রমে বসতিস্থাপনকারী মুসলমানদের জন্য একটি অনুকূল অবস্থা ছিল এই যে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে ইসলামী ব্যবস্থার প্রতি ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত বৈদিক ধর্ম ছিল কার্যত তথাকথিত নিম্নবংশে জন্মগ্রহণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে হিন্দু পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের হাতে নির্মমভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হবার একটা হাতিয়ার বিশেষ। নতুন ইসলামী বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথা সম্পর্কিত জ্ঞান তারা লাভ করার পর গরীব ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কেননা মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে ছিল সর্বক্ষেত্রে সকল মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা, তবে অষ্টম শতাব্দী থেকে প্রায় সহস্র বছর ধরে উপমহাদেশে মুসলমানদের পদচারণা চললেও সামগ্রিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং শাসক পর্যায়ে তারা সংখ্যালঘিষ্টই থেকে যায়। অবশ্য ভারতের পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলীয় বাংলা ও আসামে মুসলমানরা পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ উপনিবেশিক শাসক হিসেবে বৃটিশদের অবস্থান এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে তারা তাদের উপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদে শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের অবিমিশ্র হিন্দুদের সাথে একটি দুষ্টজোট গড়ে তোলা শুরু করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দুদের আনুকূল্য প্রদানের পাশাপাশি ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের দূরে ঠেলতে শুরু করে। যার পিছনে বিদ্যমান ছিল অনেক স্পষ্ট কারণ। যে সব সম্পর্কে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তার বিখ্যাত বই দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস (১৮৭১)-এ বিশদভাবে আলোকপাত করেন।

পক্ষান্তরে মুসলমানরাও নেটিভদের জন্য বৃটিশদের প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করে। এই পর্যায়ে অতি উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে বাঙালি হিন্দুরা অপরাপর বৃটিশ ইন্ডিয়ান নাগরিক গ্রুপ সমূহের চাইতে অনেক বেশী ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুরা কেবল ইংরেজী শিক্ষা লাভই নয়, তারা ইংরেজ শাসক শ্রেণী এবং ভারতে কর্মরত বৃটিশ কর্মকর্তাদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এবং তাদের তল্পীবাহীর ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের আর্থিক ভাগ্যও সুপ্রসন্ন করে তোলে। হিন্দুদের নিকট সেটা ছিল অনেকটা প্রভু বদলের ব্যাপার। শত শত বছর ধরে উপমহাদেশে চলা মুসলিম শাসনামলে যাদের প্রভূ ছিল মুসলমানরা। মুসলিম শাসনামলে হিন্দুরা ফার্সী ভাষা শিখতো সরকারী চাকুরী

লাভের জন্য - যা তারা রাতারাতি বদলিয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়লো বৃটিশদের শাসনাধীন আকর্ষণীয় বেতন- ভাতায় সরকারী পদ লাভের জন্যে।

ফলে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনামলের অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সারা ভারতে ব্যাপকভাবে এলিট হিন্দু শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে এলিট বাঙালি হিন্দুদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে অনেক; কেননা বৃটিশরা ১৯১১ সনে কলকাতা থেকে রাজধানী উত্তর ভারতের দিল্লীতে স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত ১৫০ বছর ধরে তাদের শাসন কার্যাদি পরিচালিত হয় কলকাতা কেন্দ্রিক। শাসন কার্যাদির কেন্দ্র দিল্লীতে স্থানান্তরের আরো কারণ ছিল। দিল্লী ছিল মোগলদের কয়েকশ বছরের শাসনামলের মূলকেন্দ্র। ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহ তথা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ সৈনিকদের বিপ্লবের পর বৃটিশরা পূরো ভারত সাম্রাজ্য নিজেদের কর্তৃত্বে নিয়ে যায়। আরো উল্লেখ্য যে বেশ কিছু উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এলিট বাঙালি হিন্দুরা রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরের কাজে বৃটিশদের সহায়তা করেছিল। এর মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমানদের প্রশাসনের স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা। কেননা বাঙালি মুসলমানরা ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সন পর্যন্ত মুসলমান সংখ্যাধিক্যের নতুন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ রক্ষার ব্যর্থ সংগ্রাম চালায়, যে প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। বাংলা- বিহার- উড়িষা নিয়ে স্বাধীন সুবে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাভূত করা পূর্বক বহু শতাব্দী ধরে মুসলমানদের রাজধানী হিসেবে পরিচিত ঢাকা বৃটিশরা দখল করে নেয়।

প্রখ্যাত বাঙালি কবি ও সেই সময়ের কলকাতা কেন্দ্রিক এক সামন্ত প্রভূ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নবগঠিত পূর্ব বাংলা প্রদেশকে বিলুপ্ত করা পূর্বক পশ্চিম বাংলার সাথে একীভূত করে রাজধানী ঢাকা থেকে কলকাতায় স্থানান্তর আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' শীর্ষক এক উদ্দীপনামূলক বন্দনাগীত রচনা করেন এবং নিজের কণ্ঠেই তার যুক্তবাংলার অনুসারীদের নিয়ে ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে গানটি গান - যে সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কি দুঃখ ও বেদনার বিষয় যে, সে গানকেই ৬৬ বছর পর ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বরণ করে নেয়া হয়। এ থেকে এমন ধারণা করা কারো পক্ষেই অসম্ভব নয় যে, গোপন কোন অসৎ উদ্দেশ্য থেকেই বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকে দুই বাংলাকে পুনঃএকত্রীকরণের উদ্দীপনামূলক বন্দনা সঙ্গীতটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করানো হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা ও

উচ্ছকিত রাখতে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধপরিকর কারো পক্ষে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে উক্ত বন্দনাগীত গৃহীত হওয়ার ব্যাপারটাকে সন্দেহজনক বলে গণ্য করা কি অযাচিত হবে ?

শিক্ষা- দীক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী হবার পাশাপাশি ১৮৮৫ সালে হিন্দু এলিটদের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস পার্টির মাধ্যমে হিন্দুরা সুসংগঠিত হয়ে পড়ায় সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বৃটিশরা তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কংগ্রেসের নিকট ছেড়ে দিলে এক বিপদাপন্ন অবস্থার আশংকা করলো মুসলমানরা। বিভিন্নভাবে শোষিত- নিযার্তিত জনগোষ্ঠী সহ সংখ্যালঘুদের মধ্যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে বৈশিষ্ঠ্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমানরা স্পষ্টতই সূদৃঢ়প্রসারী দৃষ্টিতে তাদের এবং অপরাপর অচ্ছ্যুৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিপদ দেখতে পেলো। এমনিতর বিপদের হুমকিতে তারা তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে সচেষ্ট হলো। ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো নিখিল ভারত মুসলিম লীগ যা ছিল মুসলমান নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবি, যথার্থ চিন্তায় উদ্বুধ ইসলামী পন্ডিত ও উলামাদের আশা আকাংখা বাস্তবায়নের যৌক্তিক পরিণতি। এর মধ্যে অবশ্য অগ্রগামী ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী যদিও নেতৃত্ব দেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর ঢাকায় ইন্ডিয়ান মোহামেডান সোসাইটির বার্ষিক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠানের সুবাদে মুসলীম লীগ দল প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটে; যদিও ততদিনে আগে উল্লিখিত তিন মুসলিম নেতারই ইন্তেকাল ঘটে, কিন্তু উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দীপনা সৃষ্টিতে ও সংগ্রামে যারা ছিল স্থপতি।

বৃটিশ তল্পীবাহী হিসেবে কি মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু হয়েছিল ?

বৃটিশ রাজের উপনিবেশিক স্বার্থ জিইয়ে রাখার কাজে ভূমিকা রাখার জন্য মুসলিম লীগকে কেউ কেউ অভিযুক্ত করেন। সমালোচকরা এই অভিযোগের পক্ষে মুসলিম লীগের সংবিধানের মুখবন্ধে উল্লিখিত বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের কথা কেউ কেউ বলেন। এহেন অভিযোগ রীতিমত প্রতারণামূলক। রাজ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য দেখানো সম্পর্কিত তরীকা সম্পর্কে যারা অবহিত তারা জানেন যে সেই সময়কার বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিটি কায়- কারবারে, রাজনীতিতে প্রকাশ্যে এবং দালিলীকভাবে বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ছিল একটা আবিশ্যক শর্ত। সেই সময়তো ছিলই: এমনকি আজও বৃটিশ রাজের প্রতি সর্বক্ষেত্রে আনুগত্য ঘোষণা একটা স্বীকৃতি প্রথা হিসেবে গ্রেট বৃটেনে অনুসৃত হয়ে থাকে।

যেমন বৃটিশ পার্লামেন্ট- এর প্রতি বিরোধী দলকেও বলতে হয় যে তারা হচ্ছে বৃটিশ রাজের- এর প্রতি আনুগত্যশীল বিরোধী দল। অতএব বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশ রাজ এর প্রতি আনুগত্যের ওয়াদা করার রেওয়াজ ছিল সেই সময়ের একটা বাধ্যতামূলক প্রথা; কারণ মুসলমানরা তাদের প্রতি আনুগত্যশীল নয় বলেই বৃটিশরা মনে করতো। কিন্তু হিন্দু সহ অপরাপর সম্প্রদায়সমূহকে বৃটিশরা কখনও বৃটিশ রাজ- এর প্রতি আনুগত্যশীল নয় বলে বিবেচনা করতোনা। যেমন মুসলিম লীগ বিরোধী কংগ্রেসকে কখনও বৃটিশ শাসন বিরোধী বলে বিবেচনা করার কোন অবকাশ বৃটিশদের ছিলনা; কারণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এলান অক্টোভিয়ান হিউম সহ বহু বৃটিশ ও তাদের এতদ্দেশীয় তল্পীবাহীরা। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা নবাব স্যার সলিমুল্লাহ কোন বিবেচনাতেই বৃটিশদের তল্পীবাহী ছিলেননা; বরং বৃটিশদের প্রতি তার ঘৃণা ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি কোন বৃটিশ কর্মকর্তার সাথে করমর্দন করার পর হাত ধুয়ে ফেলতেন এবং তার সোহব্বত থেকে সব সময় নিজকে দূরে রাখতেন।

বৃটিশদের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা বিনা কারণে সৃষ্টি হয়নি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী পরিচালিত ক্রুসেডের পরবর্তীতে মুসলমানদের শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা অনুকরণ করে পরবর্তীতে যে ইউরোপীয় সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে তার প্রতিটি আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মুসলমানরা। বৃটিশ নেতৃত্বে বৃটিশ মিত্র শক্তির জয়ের অব্যবহিত পরে ১৯২০ এর দশকে মুসলিম খেলাফতকে বিলুপ্ত করার বিষয় কেবলমাত্র সারা বিশ্বের সাধারণ মুসলমানরাই এটাকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া এক মহা বিপর্যয় হিসেবেই গণ্য করেনি, উপমহাদেশের মুসলমানরাও সেই বিপর্যয়কে মেনে নিতে পারেনি এবং ইতিহাসের সেই পর্যায়ে বিশ্বের অপরাপর অঞ্চলের চাইতে উপমহাদেশের মুসলমানরা ছিল অনেক বেশী সংগঠিত। তুরস্কের স্পষ্টতই ধর্মানিরপেক্ষতাবাদী নেতা কামাল পাশা বৃটিশদের পৃষ্টপোষকতা পেলেও সাধারণ মানুষ তার প্রতি সমর্থন জানানোকে তেমন বেশী ফলদায়ক মনে করেনি। তুরস্কের খেলাফত অবসানের অনতিকালের মধ্যেই খেলাফত ধ্বংসের বিরুদ্ধে ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে।

তুরস্কের লেখক হালীদী এদিব তার ইনসাইড ইন্ডিয়া বইয়ে ১৯২০ এর দশকের পরে ভারতের মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যকার অবস্থা সম্পর্কে লিখেন: ভৌগলিক বিভাজন, সংস্কৃতি এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্য পৃথক হলেও মানব হৃদয় ও আত্মার হিমালয় অনুগ্রহ করে না ভুলাই সমীচিন। আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি,

ইতিহাস, ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য, অর্থনৈতিক পদ্ধতি, উত্তরাধিকার আইন, উত্তরাধিকার এবং বিবাহ পদ্ধতি মৌলিকভাবে পৃথক- - - আমরা এক সাথে খাইনা; পারস্পরিকভাবে বিবাহ করিনা। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও প্রথা ও দিন এমনকি পোষাক- পরিচ্ছেদ পর্যন্ত পৃথক।[১]

যদিও ১৯৩০- এর দশকে বৃটেনের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী, প্রকৃতই যিনি পাকিস্তান প্রস্তাবের উদগাতা, ভারতের পশ্চিম বাংলা এবং আসাম নিয়ে পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের হায়দ্রারাবাদ নিয়ে একটি ভৌগলিক সীমারেখা নির্ণয় পূর্বক ১৯৪০ সালের ২৩- ২৪ শে মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার দুই সপ্তাহ আগে ১৯৪০ সালের ৮ই মার্চ[২] লন্ডনে মুসলমানদের জন্য প্রস্তাবিত পৃথক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ব্যক্ত করেছিলেন। একইভাবে তেমন সীমারেখা ও প্রস্তাব প্রণয়ন করেছিলেন আল্লামা ড: মোহাম্মদ ইকবাল। কিন্তু বাস্তবে জিন্নার গতিশীল নেতৃত্বে মুসলিম লীগই বৃটিশ ও তাদের তল্পীবাহী এবং কংগ্রেসের এলিট হিন্দুদের তীব্র বিরোধীতার মধ্যেই রাজপথের আন্দোলন সংগঠিত করে ১৯৪৭সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তার ফসল হাসিল করে।

ভারতের বিভিন্নমুখী চাপ ও ষড়যন্ত্রের মধ্যেও পাকিস্তানের টিকে থাকা

টিকে থাকার প্রশ্নে মারাত্মক বৈরীতার অনেক চ্যালেঞ্জ স্কন্ধে নিয়ে পাকিস্তানের জন্মলাভ ঘটে। নব জন্মগ্রহণকারী পাকিস্তান রাষ্ট্রের নানাবিধ দূর্বলতা ও অর্থনৈতিকভাবে বিপদাপন্ন অবস্থা সত্ত্বেও বিশ্বের খৃষ্টান, হিন্দু ও ইহুদী শক্তি পাকিস্তানকে অনেক উচ্চ মাত্রার প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে গণ্য করে। ভারতের তুলনায় পাকিস্তান কেবল অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ছিলনা; উপরন্ত শিক্ষা- দীক্ষায় এবং রাজনীতিতেও অনেক অনগ্রসর ছিল। ভারতের তুলনায় পাকিস্তানে এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা - যার সহায়তায় দেশে কার্যকর একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা যেতো।

প্রফেসর রালফ ব্রেইবন্ত তাঁর বইয়ে বিপদসংকুলভাবে শুরু হওয়া পাকিস্তানের পাশাপাশি ভারত যে কত বেশী শক্তিশালী ছিল তার কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেনঃ "ভারত উত্তরাধিকার সূত্রে একটি অত্যন্ত মনলোভা সরকারী যন্ত্র, অত্যন্ত

[১] ওহিদ- উজ- জামান, টুওয়ারডস পাকিস্তান, পাবলিশার্স ইউনাইটেড লিঃ, লাহোর, ১৯৬৪, পৃ: ১৫১, হালিদী এদিব প্রণীত ইনসাইড ইন্ডিয়া থেকে উদ্ধৃত পৃ: ৩৬২

[২] ঐ, পৃ: ১৫১- ৫২

অভিজ্ঞ আমলাদের ক্যাডার এবং গভীর মনস্তাত্বিক সুবিধা ছিল প্রাচীন ভারতের উত্তরাধিকারী একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্তনিহিত বাস্তবতা।" পক্ষান্তরে পাকিস্তানকে তার নামের প্রতি সুবিচারকারী একটি জাতি সৃষ্টি করতে হয়েছে। আর সরকারী যন্ত্র তৈরী করতে হয়েছে। একটি নতুন ইমেজ নিয়ে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার অসুবিধাজনক প্রেক্ষাপট ছিল পাকিস্তান বিরোধী পারিপার্শ্বিকর্তার জিগির সৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে। এই অবস্থা অধিকাংশ পশ্চিমাদের মতে ভারতের জন্য ছিল অত্যন্ত সহায়ক। 'প্রাচীন ভারত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নতুন রাষ্ট্র ভারত পশ্চিমাদের সহানুভূতি কুড়ায়। পক্ষান্তরে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি পশ্চিমাদের নিকট ছিল এক ধরণের রাজনৈতিক পলায়ন যা ভৌগলিক সিমেট্রি ও ভারতীয় সভ্যতার পরিচিতিতে ধ্বংস সাধন করেছে- - সে জন্য পাকিস্তানকে শুরু থেকেই পশ্চিমাদের মজ্জাগত ইসলাম বিদ্বেষী দৃষ্টিকোন থেকেই গণ্য করে আসা হচ্ছে।'[৩]

পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন প্রত্যেকেরই এটা জানার কথা যে পাকিস্তান শুরু হয়েছিল সম্পূর্ণ শুন্য অবস্থা থেকে। বৃটিশ ভারতে অর্জিত রাজস্ব আয়ের মধ্যে পাকিস্তানের নির্ধারিত প্রাপ্য ৬০ কোটি রূপী যা দিল্লীর সেন্ট্রাল রিজার্ভ ব্যাংকে গচ্ছিত ছিল, তা পাকিস্তানকে প্রদান করতে ভারত রাজী হয়নি। ফলে নব্যরাষ্ট্র পাকিস্তান শুরুতে সরকারি কর্মচারীদের বেতন পর্যন্ত দিতে পারেনি। তবে হায়দারাবাদের নিজামের বদান্যতায় অবশ্য পাকিস্তান তার কর্মচারীদের বেতন শেষমেষ প্রদান করতে সক্ষম হয়। রাজধানী করাচীতে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের কোন ভবনও ছিলনা। রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও টাকা লেনদেন- এর জন্যে কোন ষ্টেট ব্যাংক ছিলনা। এমনকি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কোন প্রশাসনও ছিলনা - যা দিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অর্থাৎ পাকিস্তানকে সবকিছুই শুন্য থেকেই শুরু করতে হয়েছে এবং আস্তে আস্তে সকল ক্ষেত্রে ন্যুনতম অবস্থা তৈরী করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের শোচনীয় অবস্থার পাশাপাশি রাজধানী দিল্লী কেন্দ্রিক অবস্থা ভারত বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সকল সুবিধা ব্যবস্থাদিই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে রাজকীয় হালতে তাদের দেশ পরিচালনা শুরু করে।

অবশ্য পাকিস্তান ও ভারতের উভয়ের জন্য উদ্বাস্তু সমস্যা ছিল প্রায় একই রকম। তবে ভারত বড় দেশ হিসেবে বড় সম্পদের অধিকারী হওয়ায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সেখানে কম ঝক্কিতেই নিস্পন্ন করা সম্ভব হলেও সম্পদের দুষপ্রাপ্যতা

[৩] রাল্ফ ব্রেইবান্তী, সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানঃ এ থিয়োরেটিক্যাল এনালাইসেস নিবন্ধটি আটলান্টিক কোয়াটারলীতে প্রকাশিত হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক ইউনির্ভাসিটি কর্তৃক ১৯৫৯ সনে পুনঃ মুদ্রিত, পৃ: ২৯২

এবং ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের উদ্বাস্তু সমস্যার ব্যাপ্তি অনেক প্রকট ও বহুমুখী হওয়ায় পাকিস্তানকে এনিয়ে হিমশীম খেতে হয়েছে মারাত্মকভাবে। যে কেহই এটা অনুধাবন করবেন যে ১৯৪৭ সালের অল্প আগে ১৯৪৩- ৪৪ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তানে যখনও সে দুর্ভিক্ষের রেশ চলতে ছিল সেই সময় উদ্বাস্তুদের পূর্নবাসন যে কত বেশী ব্যাপক ও মারাত্মক ছিল। তা সহজে আনদাজ করার বিষয় বটে।

অন্য আর একটি বিষয়ও সঠিকভাবে মনে রাখতে হবে যে, মাউন্টবেটেন তার বৃটিশ সাঙ্গাত রেডক্লিফ- এর সাথে মিলে এমনভাবে সীমানা চিহ্নিত করে যা পাকিস্তানকে আরো এক ধরণের সংকটে নিপতিত করে। গুরুদাসপুর পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হওয়া সত্ত্বেও রেডক্লিফ রোঁয়েদাদ তাকে ভারতের সাথে অঙ্গীভূত করে দেয়, যার ফলে জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়; একইভাবে পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আসামের করিমগঞ্জ জেলা দিয়ে দেয়া হয় ভারতকে, যার ফলে পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তানকে আর এক ধাপ দুর্বল অবস্থায় নিপতিত করে ভারতকে শক্তিশালী করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি করিডোর সংযোগ দেয়ার অতি প্রয়োজনীয় দাবীকে নিদারুণভাবে প্রত্যাখান করা হয়।

অযোচিতভাবে এমনিতর ভঙ্গুর পাকিস্তানী সীমান্ত ব্যবস্থা মেনে নেয়ার জন্য বৃটিশ ভাইস রয় মাউন্টব্যাটন কংগ্রেস নেতাদের ষড়যন্ত্রের সাথে মিলে জিন্নাহর উপর এই মর্মে চাপ প্রয়োগ করে যে উক্ত সীমান্ত ব্যবস্থা হয় তাকে মানতে হবে অথবা পাকিস্তানের দাবী চিরতরে পরিত্যাগ করতে হবে। জিন্নাহর সামনে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য সৃষ্ট সমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে কাট- ছাট করা ও পোকায় খাওয়া পাকিস্তানকে গ্রহণ করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিলনা; কেননা জিন্নাহ এটা যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন যে অল্প- স্বল্প যা কিছুই পাওয়া যায়- অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সেটা গ্রহণ করাই উত্তম। নব্য রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নানাধরণের অপমানজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও উৎকট স্বাদেশিকতায় উদ্বুধ ভারতের ঝাল মেটেনি; পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ও বিপদাপন্ন দেশ এবং অঞ্চলসমূহ গিলে খাবার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগে। ভারতের সেই মারাত্মক আগ্রাসী চরিত্রের কিঞ্চিত নতীজা, আচরণ ও আলামত পরিস্ফুট হয় সেই সময়কার এক হিন্দু নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর বক্তব্যে। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ফজলুল হক মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী আশুতোষ মুখার্জীর ছেলে। শ্যামা প্রসাদ এই মর্মে মন্তব্য

করেছিলেন যে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পর ৬ মাসের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এটাও সর্বজনবিদিত যে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওয়াহেরুল নেহেরু তিন তিনবার পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশী এ্যাকশান শুরু করা পূর্বক তা দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা এটেছিলেন; কিন্তু তিনবাবই তিনি তা করা থেকে শেষ- মেষ নিবৃত্ত থাকেন। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে গভীর ভারত বিরোধী বিক্ষুদ্ধতা লক্ষ্য করেই নেহেরুকে তার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ছাড়পত্র দেয়নি। ভারতের নানাবিধ আগ্রাসনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কত গভীরভাবে বিক্ষুদ্ধ ছিল তার কিছু প্রকাশ ঘটে ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের সময় - যা থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে নেহেরু তার পরিকল্পিত পুলিশী এ্যাকশানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান দখল করার চেষ্টা করলে তাঁর ও ভারতের জন্য তা হতো এক মর্মান্তিক ব্যার্থ অভিযান - যা নিজ বুদ্ধি- জ্ঞান দিয়ে নেহেরু উপলব্ধি করেই শেষ পর্যন্ত নিজকে সংযত করেন। ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ ছিল ভিন্নতর। তবে ১৯৭১ উত্তর সময় থেকে বাংলাদেশে জনগণের মধ্যে বিদ্যমান ভারত বিরোধী মনোভাব এটা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে পতাকার পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগণ কোন অবস্থাতেই তাদের মুসলিম পরিচিতি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে বিসর্জনতো দূরের কথা, বরং যে কোন মূল্যে যে তা রক্ষা ও উচ্ছকিত রাখতে ওয়াদাবদ্ধ থাকবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতীয় আধিপত্যবাদের কারুকাজ/চক্রান্ত বুঝতে হবে

এতে কোন সন্দেহ নেই যে ১৯৭২ সালের পর থেকে বাংলাদেশের মন ও মানসকে ভারতীয়করণের জন্য প্রচুর বস্তুগত আর্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাহায্য ও সমর্থন ভারত যুগিয়ে আসছে। বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমসমূহের এক বিরাট অংশ ভারতীয় মার্কা অপপ্রচার- এর প্রতিপাদ্য দিয়ে পরিচালিত। তথাকথিত আধুনিক স্কুল সমূহের শিক্ষা কারিক্যুলাম বিশেষত সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পূর্ণভাবে ইসলামিক মূল্যবোধ ও গুণাবলী বিরোধী বৈদিক দর্শনের অনুকরণে প্রণীত। আমলাতন্ত্র, প্রশাসন শিক্ষক সমাজ এবং কায়েমী স্বার্থবাজদের নতুন গোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতীয় সংস্কৃতির আজ্ঞাবহের ভূমিকায় অবতীর্ণ রয়েছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যাদের কোন অবস্থানই নেই। সম্ভাব্য সকল ধরণের মস্তিস্ক ধোলাইয়ের অপচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও আজ অবধি তারা সফলকাম হতে পারেনি; জনগণ আজও ভারত বিরোধী এই জন্যে যে ভারত বাংলাদেশের

সাধারণ জনগোষ্ঠীর জীবনাচারের মৌলিক ভিত্তিকে ধ্বংস করতে চায়। দেশের অর্থনীতি ও উৎপাদনশীলতার যে কাঠামো সাধারণ গরীব ও নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবন ধারণের ভিত্তি তা ভারতের প্রভূসূলভ আচরণে হুমকিগ্রস্ত। ভারতের নির্মিত ফারাক্কা বাধ- এর বিষময় ফলে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ এলাকা মরুভূমিতে পর্যবসিত হয়ে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ জনগণের জীবন ও জীবিকাকে হুমকিগ্রস্ত করে ফেলেছে।

বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্যের এসব হচ্ছে যৎকিঞ্চিত নমুনা। উল্লেখ্য যে, দুই দেশের ৫৪ টি অভিন্ন নদীর মধ্যে বাংলাদেশের উজানের ভারতে প্রবাহিত ৫৩টি - যার প্রায় প্রত্যেকটিতে বাঁধ, গোয়েন, স্পার নির্মাণ করে উজানের পানি নিয়ন্ত্রণ পূর্বক শ্বাসরোধ করে বাংলাদেশের ভাটিতে বিপর্যস্তকর অবস্থায় ফেলে তার অর্থনীতির অস্বাভাবিক তথা অপমৃত্যুর ঘটনার চেষ্টায় লিপ্ত ভারত। অর্থাৎ বহুল পরিচিত ভিত্তিক বাংলাদেশে আজ এক মৌসুমে খরা আর বর্ষা মৌসুমে বন্যার ছোবলে ক্রমবর্ধমানহারে বিপর্যস্ত হচ্ছে।[৪]

এছাড়াও ভারতের শিল্পজাত পণ্যের অবাধ প্রবাহ বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে। আনুষ্ঠানিক চ্যানেল এই পণ্য প্রবাহের যে অবস্থা তার চাইতে অনেক অনেক বেশী এই পণ্য প্রবাহ চলছে দু' দেশের ১৭০০ মাইল সীমান্ত পথের চোরাচালান রুটে।

বাংলাদেশের এই যাবতকালের সকল শাসক শ্রেণীই তারা যে মত ও পথের হোক না কেন; ভারতের পদাঙ্কই অনুসরণ করে আসছে। এটা বাস্তব অবস্থার আলোকে কেবল অযৌক্তিকও নয়; কেননা দিল্লীর গুডবুক- এ থাকা ও ভারতে কৃপা লাভের চাইতে অন্য কিছু চিন্তা করার অবকাশই শাসকশ্রেণীর নেই। ১৬ই ডিসেম্বরের কয়মাসের মধ্যে থেকেই ভারতের অনুকম্পা শেখ মুজিব (কলকাতার জনৈক অরুণ চক্রবর্তীর ছেলে যার নাম প্রথমে ছিল দেবদাস চক্রবর্তী, যাকে তিন বছর বয়সে ১৯২৩ সালে শেখ লুৎফুর রহমান পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নাম রাখেন মজিবুর রহমান - ডঃ এম,আই চৌধুরী, জীবনস্মৃতি, ঢাকা ২০০৬ পৃষ্টা, ৬৪২- ৪৩) কর্তৃক ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ভারতের সাথে ২৫- সালা মেয়াদী এক চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে ভারতের অনুকম্পায় থাকা

[৪] বেন ক্রো, ইটি এএল, শেয়ারিং দি গ্যাঞ্জেস, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৫, এম, রফিকুল ইসলাম গ্যাঞ্জেস ওয়াটার ডিসপ্যুটঃ ইটস ইন্টারন্যাশনাল লিগ্যাল এসপেক্টস, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৮৭, বি,এম, আব্বাস এটি, দি গ্যাঞ্জেস ওয়াটার ডিসপ্যুট, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৮২ ইত্যাদি

বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত চুক্তির অষ্টম, নবম এবং দশ নম্বর ধারার শর্ত সমূহই হচ্ছে ঢাকার ক্ষমতায় আরোহনকারী সবারই ঘাড়ের উপর তলোয়ার স্বরূপ; যাদেরকে পরিচালনার জন্য দিল্লীর সরাসরি খবরদারীর তেমন প্রয়োজন পড়েনা। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ১৯৪৭ সাল থেকে সক্রিয় ভারতীয় লবীর ঘনিষ্ঠ সহযোগে বাংলাদেশের বড় বড় কর্তাব্যক্তিদের অব্যাহতভাবে হুমকি প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন বিষয়াদিতে বহুমাত্রিক ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও আধিপত্যবাদী তৎপরতা বাস্তব সত্যি - যা সর্বজনবিদিত। ভারতের এই ধরণের হস্তক্ষেপ এর সাথে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্তক্ষেপ এর সাথে তুলনীয়। পলাশীর যুদ্ধেরর অনতিকাল পূর্বে মীর জাফরের সাথে কোম্পানী কর্মকর্তা ক্লাইভ যে চুক্তি (পরিশিষ্ট- ২) করিয়ে নেয়, তার দুই নং ধারায় বলা হয়ঃ 'ইংরেজদের শত্রু, তা সে ইউরোপীয় হোক কিংবা হোক ভারতীয়, তারা আমারও শত্রু।'

গত কয়েক দশক ধরে বিপদাপন্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করতে গিয়ে বাংলাদেশের যে অভিজ্ঞান ও আক্কেল হয়েছে, তা থেকে যথেষ্ট শিক্ষা নেয়ার আছে। এই শিক্ষা প্রথমে হতে পারে ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে; যা নিতে হলে ১৯৭১ সালের পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ নতুন ও নিরাবেগপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্র হতে হবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় অর্জিত বিজয় বাংলাদেশের জন্য তেমন কোন বিজয় ছিলনা, যতটা না ছিল ভারতের জন্যে।

দ্বিতীয় অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা নিতে হবে এই বাস্তবতা থেকে যে স্বাধীনতার যৎসামান্য স্বাদ বাংলাদেশীরা লাভ করতে না করতেই তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শাসকরা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ফলে বাংলাদেশ বাস্তবে ভারতের দখলকৃত একটি ভূখন্ডেই পর্যবসিত হয়েছে, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওসমানীর রহস্যজনক অনুপিস্থিতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের আত্মসমর্পনের দলিলই ভারত কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান দখল করার স্পষ্ট ও বৈধ প্রমাণ। শেখ মুজিব ফিরে এসে ২৫ বছর মেয়াদী যে চুক্তিতে দেশকে আবদ্ধ করেন তা ছিল বস্তুতঃ ১৯৭১ সালের তাজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী সরকার স্বাক্ষরিত গোপন চুক্তির ৭টি

ধারার পরিবদ্ধিত সংস্করণ[৫] এবং ২৫ বছরের সে চুক্তির দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মসমর্পনের উক্ত দলিলের উপর বৈধতার সীল মেরে দেয়া হয়। যা ছিল আর এক অর্থে ভারতের গোলামীর নিশ্চয়তা এবং এতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আধিপত্য চালনার আইনানুগ কর্তৃত্ব লাভ করে ভারত। ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে নিজেদের স্বার্থে যে সব ক্ষমতা ও অধিকার ভারত লাভ করে তা যে কোন মূল্যে চিরস্থায়ী করতে তারা বদ্ধপরিকর। ঐ কুখ্যাত চুক্তির নবায়ণ কিংবা অন্য নামে একই মাত্রায় আর একটি চুক্তিতে বাংলাদেশকে আবদ্ধ করার পরিকল্পনাও রয়েছে ভারতের।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়কার দেখা দেয়া রাজনৈতিক অচলাবস্থার অধিকাংশ কারণ হচ্ছে দিল্লীর ঐ লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাব্য কোন ক্ষেত্র। গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশকে নামেমাত্র স্বাধীন রাখার ভারতীয় কৌশলের এখানেই শেষ নয়। বাংলাদেশকে নিয়ে তার লক্ষ্য অর্জনে তাদের আরো কিছু অত্যাবশাকীয় কাজ রয়েছে। এই কাজগুলো হচ্ছে বাংলাদেশকে সর্বব্যাপ্ত ও অনতিক্রান্ত চাপের মধ্যে ফেলা। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সক্রিয় ভারতীয় তল্পীবাহীদের দিয়ে নেতিবাচক রাজনীতি করানো, ভারতের শিল্পজাত পণ্যের বাজার প্রতিষ্ঠার জন্যে শুরু থেকেই বিপদাপন্ন অর্থনীতিতে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালিয়ে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করা, পরিকল্পিতভাবে ভারতীয়করণের জন্যে স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা, বাংলাদেশের সাথে পানি বণ্টনে সমঝোতা আসার আহবান প্রত্যাখান করা পূর্বক সকল আন্তর্জাতিক আইন নিয়মনীতি পদদলিত করে[৬] অভিন্ন ৫৩টি নদীর উজানে পানি প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে ভাটির দেশ বাংলাদেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করা। পাকিস্তানের করাচীর ন্যায় ভারতীয় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করা, চাকমা ইস্যু নিষ্পন্নে অনাগ্রহ তথা সৎ প্রতিবেশীমূলক আচরণে অনীহা, তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনের দ্বারা বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ ভূখন্ডকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে মদদ ও পৃষ্টপোষকতা প্রদান এবং সর্বোপরী দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপকে দখলে করে রেখে ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রক্তচক্ষু ও বিষদাঁত দেখাচ্ছে বিগত তিন দশকব্যাপী। এ ছাড়াও ট্রানজিট সুবিধাসহ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে সেনা অভিযান চালানোর সুযোগ প্রদানের জন্যে ভারত বাংলাদেশের উপর অব্যাহত

[৫] অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫- ৭৫) দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, এনডি, পৃ: ৪৫০

[৬] এম, রফিকুল ইসলাম, পূর্বে উদ্ধৃত

চাপ প্রয়োগ করে চলেছে এবং বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দরকে আনসেন্সরড ব্যবহারের জন্য ভারত চাপ প্রয়োগ করে চলেছে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের আধিপত্যের রকমফের অন্তহীন। সময়ে তাদের আধিপত্যের বিভিন্ন প্রকরণ জনপ্রিয় অবয়বও ধারণ করে, যা কেবল বাংলাদেশে তাদের তল্পীবাহী রাজনৈতিক দলসমূহের সৃষ্ট বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; নানাবিধ শ্রমিক আন্দোলনেও তা পরিস্ফুট হয়। আর এই সব আন্দোলন ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা'র কর্তৃক পরিকল্পিত, সংগঠিত ও অর্থায়ন হয়ে থাকে। জামাতে ইসলামের নেতা গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১৯৯০ সালে ঘাদানিক আন্দোলন তেমন একটি। প্রায় ২০টি কিংবা তার কাছাকাছি বা তার বেশী সামরিক অভ্যুত্থান বা পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান, যার দরুণ প্রকারান্তরে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হোন, তা ছিল তাদের অন্যতম মিশন। এটা কেবল 'র' এর কর্মকর্তাদের স্বীকারোক্তিতেই নয়;[৭] ভারতের বহু বিশ্বস্ত সূত্র ও মিডিয়া তা নিশ্চিত করে। প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে 'র' এর অনুপ্রবেশ ছিল অনেকভাবে, অনেক স্তর ও পর্যায়ে - যা বাংলাদেশ আমলে এত ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি ঘটে যে 'র' এবং দিল্লী কারো পক্ষেই এই সব তথ্য গোপন রাখা সম্ভব হয়নি।[৮]

পূর্ব পাকিস্তান জন্মের প্রায় শুরু থেকে ভারতের ষ্টেটসম্যান পত্রিকার ঢাকা অফিসে দায়িত্বপালনকারী ভারতীয় সাংবাদিক জ্যোতি সেন গুপ্ত স্বীকার করেছেন যে, শেখ মুজিবর রহমান সহ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বহু মহলের সাথে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। সেই গোয়েন্দা সংস্থাই এক বিভ্রান্তিকর রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং (RAW) নামে ষাট এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কাজ শুরু করে।

'র' এর কর্মকর্তারা বাংলাদেশকে এই মর্মে সর্বদাই নছিয়ত দিতে থাকেন যে বাংলাদেশ সামাজিক পর্যায়ে অবশ্যই তাদের শিকড়ের সন্ধানে ব্যপৃত হওয়ায় উচিত; যে শিকড় 'র' এর মতে হচ্ছে নিখাদ সনাতন ধর্ম। আর এই দৃষ্টিকোন থেকে ইসলাম হচ্ছে বিদেশী ধর্ম যার উৎস আরবের মাটি থেকে উৎসারিত। এ থেকে কি এমন প্রশ্নের উদ্রেক হয়না যে তাহলে কি বাংলাদেশীদেরকে হিন্দু দেবতা শিব, কালী, দুর্গার পূজা করতে হবে? নবজাত শিশু হত্যা শুরু করতে হবে?

[৭] অশোক রায়না, স্পেশাল অপারেশানঃ বাংলাদেশ, ইনসাইড'র', বিকাশ পাবলিশিং হাউস (প্রাইভেট) লিঃ, দিল্লী, ১৯৮১, পৃ: ৫০- ৬৩

[৮] ঐ, পৃ: ৬১- ৬২

মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা পুনঃরায় শুরু করতে হবে? মুসলমানদেরকে মানবিক সমতার আদর্শ পরিত্যাগ করে মানুষের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে বনেদি ও অচ্ছ্যুৎ শ্রেণী প্রভেদ সৃষ্টির কাজ শুরু করতে হবে ?

বদ্ধপরিকর হওয়া দরকার

স্পষ্টতই এই প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক শক্তি যারা জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশ তারা সমেত ১৫ কোটি মানুষ কি বাংলাদেশকে অব্যাহতভাবে ভারতীয় কবজায় রাখার ব্যাপারটা অনুমোদন করে ? তারা কি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেনা ?

কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের পরিতৃপ্ত হয়ে থাকা যাবেনা

১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র বাংলাদেশ এক বিপদাপন্ন অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান তেমন বিপদাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়নি কিংবা ভারতের চাইতে দুর্বল হয়নি; তবে পাকিস্তান ততটুকু শক্তিশালী নয় যতটুকু হতো দুই অংশ ঐক্যবদ্ধ থাকলে। পাকিস্তান হয়তো কতগুলো ক্ষেত্রে তার অর্জিত অগ্রগতিতে পরিতৃপ্ত হতে পারে, যার মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে অপমান এবং ধ্বংসস্তুপ থেকে সর্বক্ষেত্রের অবস্থার উন্নয়ন; কেননা অর্থনৈতিক সুচকের প্রণীত তথ্যাদি অনুযায়ী কেবল বাংলাদেশ থেকেই নয়, ভারতের চাইতেও পাকিস্তানের জীবন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে; যা পাকিস্তানের উন্নয়ন, সমৃদ্ধ জীবন ব্যবস্থা, দরিদ্রতা হ্রাস এবং গণতন্ত্র ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মোটামোটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের মধ্যেই নিহিত। ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে যে আত্মবিশ্বাস পাকিস্তান হারিয়ে ফেলেছিল তা পাকিস্তান পুনরুদ্ধার করে বর্তমানে অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েট আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব মোকাবেলায় প্রায় এক দশকের যুদ্ধে পাকিস্তানের সাফল্য তাকে যে কোন বৃহৎ ও শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজকে রক্ষা করতে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছে। কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান আজ পর্যন্ত না হওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীরিদের প্রতি কয়েক দশক ধরে পাকিস্তানের আর্দশিক ও নৈতিক সমর্থন ইস্যুটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যে কোন আলোচ্যসূচীর অগ্রে স্থান দিয়েছে। ভারত কাশ্মীর ইস্যুতে বরাবরই কলংকজনকভাবে পরাভূত হয়ে আসছে। মোট কথা এটা নিঃসন্দেহ যে পাকিস্তান তার শক্তিই কেবল পুনরুদ্ধার করেনি; স্বীয় ঐক্য ও সংহতি এবং সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যতা

চিরতরে রক্ষা করতে যথেষ্ট আস্থাবান। ভারত হয়তো মাঝে মধ্যে আক্রমণ ও তার সক্রিয় দালালদের দিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাতে পারে; কিন্তু পাকিস্তান দখল করার মত স্পর্ধা তার নেই যদি সে তার নিজকে ধ্বংস করতে না চায়। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থান সে রকম নয়। ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ বরাবরই একটি অসহায় সত্ত্বা হিসেবে বিরাজ করছে। ভারতের প্ররোচনা ও পৃষ্টপোষকতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নানা ধরণের ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতা চরমে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের জনগণ অব্যাহতভাবেই ভারতের সামরিক আগ্রাসনের হুমকি অনুভব করে। যেভাবে সিকিম ভারত তার বশংবদ সংসদের মাধ্যমে গ্রাস ও হজম করেছিল সে ষ্টাইলে বাংলাদেশে ভারত তার তল্পীবাহী বা পঞ্চম বাহিনী দ্বারা আগ্রাসন চালাতে পারার একটা আশংকা সব সময়ে বাংলাদেশকে তাড়া করে। তথাকথিত চরম পন্থী বাঙালী জাতীয়তাবাদীরাই আসলে ৫ম বাহিনী হিসেবে সর্বজন বিদিত। সহস্র বছর ধরে বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের ৯০ শতাংশ মুসলমান যে মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্যতা অনুসরণ, রক্ষা ও চর্চা করে আসছে এই বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা হচ্ছে তার সবচাইতে বড় শত্রু। অতএব ভারতীয় আধিপত্য কার্যকরভাবে প্রতিহতকরণে বাংলাদেশকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে উপমহাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতা থেকে। আর এই লক্ষ্যবোধ থেকে যথাযথ দিক- নির্দেশ- এ উদ্ধুধ হতে হলে বাংলাদেশ অবশ্যই পাকিস্তানের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে হবে।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ভারতের বিরোধীতা

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সৌভাতৃত্বমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকে ভারত বরাবরই ঘৃণার চোখে দেখে আসছে। ভবিষ্যতেও এমন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে তারা ঘৃণা করবে। কেননা বাংলাদেশ প্রকৃতই একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম শক্তিশালী দেশ হিসেবে টিকতে পারলে ১৯৪০ সালের লাহোরে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা লাভ এবং আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে দ্বি- জাতিতত্ত্ব যাকে ইতিহাস বর্ণিত মতে কংগ্রেসী ও বাজপেয়ী, বসন্ত চ্যাটির্জী সহ হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা তীব্রভাবে অবজ্ঞা করে- সেই দ্বি- জাতিতত্ত্বের যৌক্তিকতাই প্রমাণ হবে। [৯]

[৯] বসন্ত চ্যাটার্জী, ইনসাইড বাংলাদেশ টুডে, এস, চান্দ এন্ড কোঃ (প্রাইভেট) লিমিটেড, দিল্লী, ১৯৭৩

যদিও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অভিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দুইটি দেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটে; কিন্তু ১৯৭১ সালের বিয়োগাত্মক নাটক মঞ্চায়ন এবং তার ধারাবাহিকতা ও জের অব্যাহত রাখার উৎকট প্রয়াসের লক্ষ্য একটাই -দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী ঝগড়া জিইয়ে রাখা। একসময়ের তথাকথিত বৈষম্য ইস্যুকে আজও জিইয়ে রেখে তাকে সুযোগ পেলেই শান দেয়ার লক্ষ্যই হচ্ছে দুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে রাখা। অথচ সেই তথাকথিত বৈষম্যতত্ত্ব ছিল নিতান্তই ভিত্তিহীন যা বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী একটি মুসলিম দেশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনমত সৃষ্টির কাজে ভারত ব্যবহার করে। ভারতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহের অসত্য ও অর্ধসত্য প্রচারণাগুলোই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে অব্যাহতভাবে পরিচালিত অপ্রচারসমূহ বস্তুত সেই প্রচারণারই পরিবর্ধিত রূপ। তথাকথিত ৩০ লক্ষ মানুষের নিহত হবার মিথ্যা সংখ্যাতথ্য বাংলাদেশ ও ভারতের প্রচারমাধ্যম সমূহে অব্যাহতভাবে প্রচার করা হয়, যার লক্ষ্যই হচ্ছে নানাবিধ প্রেক্ষাপটের দুই বন্ধুপ্রতীম দেশের সাধারণ মানুষের মনে পারস্পরিকভাবে বিদ্বেষভাব জিইয়ে রাখা। বস্তুতঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটানোই হচ্ছে এই ভয়াবহ অপপ্রচারের মূল সূত্র।[১০] বলা বাহুল্য যে, ঐ বিলুপ্তকরণের অপপ্রয়াস থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়।

বাংলাদেশের চাইতে অনেক শক্তিশালী দেশ পাকিস্তান যদি বিলুপ্ত হবার ভারতীয় হুমকিতে নিমজ্জিত থাকতে পারে, সেখানে মুসলিম সত্ত্বা নিয়ে ভারতীয় আক্রমণের মুখে বাংলাদেশের টিকে থাকা সত্যিই দুস্কর। পাকিস্তান অথবা বাংলাদেশের ভূখন্ডগত তথা ভৌগলিক অবস্থান ভারতের নিকট কোন গুরুতর উদ্বেগের বিষয় নয়; তাদের উদ্বেগ হচ্ছে দুই দেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিতে মুসলিম জাতিসত্ত্বা ও ইসলামিক স্বাতন্ত্র্যের প্রাবল্য। তাদের নিকট ইসলাম ও বিদেশী মুসলমানরা হচ্ছে তাদের বড় শত্রু -যা ১৯৪৭ সালে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটায় পাকিস্তানকে এক নম্বর শত্রু হিসেবে তারা চিহ্নিত করে। কেননা পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে ছিল বৃটিশ ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফসল যার ভিত্তি ছিল দ্বি- জাতিতত্ত্ব আর তার অর্থই ছিল মুসলমান ও হিন্দুদের সত্ত্বা ও স্বাতন্ত্র্যের স্পষ্ট ভিন্নতা। ফলে বৃটিশরা ভারত ছেড়ে দেয়ার আগে দুইটি সার্বভৌম পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি করা পূর্বক উপমহাদেশকে স্বাধীনতা দেয়া ছাড়া বৃটিশ ও কংগ্রেস- এর

[১০] জুলফিকার আলী ভূট্টো, মাই ডিয়ারেষ্ট ডটার, ক্লাসিক, লাহোর, ১৯৯৫, পৃ: ৫১

সামনে আর কোন পথ খোলা ছিলনা। তবে তারা ১৯৪৭ সালে তাদের ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদন কোন শর্ত বা উদ্দেশ্য ছাড়া মেনে নেয়নি। আর পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ টিকে থাক - এমন উদারতার বশে ভারত বাংলাদেশকে একাত্তরে সমর্থন দেয়নি। তাদের প্রকৃত স্বার্থের প্রথম ধাপ হচ্ছে বাংলাদেশকে ভারতীয়করণ এবং পরবর্তীতে সুযোগ মত বাংলাদেশকে সিকিমকরণের জন্য ঘুম পাড়ানীর টেবলেট খাইয়ে দেয়া। ভারতীয় প্রচার মাধ্যম ও তাদের বাংলাদেশী তল্পীবাহী মহলের অসত্য ও ভিত্তিহীন প্রচারনাসমূহ নিয়ে বার বার মাতম করার পিছনে রয়েছে ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী চক্রান্তের কিছু নোংরা দিক। এই নোংরা দিকগুলো ভারতীয় হিন্দুদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত। তাদের হিন্দু ধর্মমতে অখন্ড ভারত অথবা রামরাজ্য তথা দেবরাজ্য খন্ডন করা যাবে না; কোন কারণে খন্ডিত হলেও তাকে পুনরায় একত্রীকরণ করা ধর্মীয় মতে বাধ্যবাধকতাপূর্ণ; কিন্তু বাস্তবের পরিস্থিতি যে ভিন্ন এটা তারা এখনো অনুভব করতে পারেনি। তাদের দুই লক্ষ্য সাধনে তারা ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিশ্চিত করার জন্যে নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের লেলিয়ে দিয়ে রেখেছে। তারা চায় এই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই উনিশ' চল্লিশের দশকের ভারতীয় নেতা গান্ধী, নেহেরু, শ্যামাপ্রাসাদ মুখার্জী প্রমুখ পাকিস্তানের দুই অংশকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করতে বহুভাবে উদ্ধুদ্ধ করেছিল।

বাংলাদেশ সৃষ্টি ভারতের 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা'

ভারতীয় সাংবাদিক প্রাণ চোপড়া ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহের অব্যবহিত পরেই বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের সৃষ্টি হচ্ছে ভারতের জন্য 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন'[১১]

প্রথমটি তারা হাসিল করেছিল ১৯৪৭ সালে যখন বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যায়। এই ধরণের ধারণা কেবল চোপড়ার একার নয়; এই ধারণা সমগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের যারা মুজিবকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের এক সহস্র বছরের বিজয়ের নায়ক বলে মনে করে। আর দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীদের নিকট মুজিবের পরিচয় হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর মীর জাফর যে সম্পর্কে বহু দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীদের মত জনাব কে এ হক যথাযথভাবে তার ২০০৭ সালে প্রকাশিত একটি বইয়ের নামকরণ করেছে দুই পলাশী দুই মীর জাফর। ইতিহাস সম্পর্কে

[১১] প্রাণ চোপড়া, ইন্ডিয়াজ সেকেন্ড লিবারেশান, বিকাশ পাবলিশিং হাউস (প্রাইভেট) লিমিটেড, দিল্লী, ১৯৭৩

সচেতন যে কোন বিজ্ঞ পাঠক এমন উপসংহারই টানবেন যে বাংলাদেশকে ভারত মাতার দখলে নিতে পারলে তাকে তারা তাদের তৃতীয় স্বাধীনতা হিসেবে আখ্যায়িত করবে আর চতুর্থ স্বাধীনতা হবে বোধ হয় তখন, যখন তারা পাকিস্তানের সমগ্র এলাকা দখল করে ফেলতে পারবে। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্যি যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয়েই ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল, যা গত ছয় দশকেও হিন্দুরা মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারেনি। হিন্দুরা চায় উপমহাদেশের সমগ্র মুসলমানরা যেন হিন্দুয়ানী জীবনাচার -এ অভ্যস্থ হয়ে উঠতে অথবা যেন ভারতীয়করণে গা ভাসিয়ে দেয়, আর পক্ষান্তরে মুসলমানরা গৌরবের সাথে মুসলমান হিসেবে টিকে থাকতে বদ্ধপরিকর। এটা কেবল মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসেরই অংশ নয়; এটা নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসারও পরিচায়ক। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মহাসমুদ্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে মুসলমানদের হজম হয়ে যাওয়া কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। অতএব দুই মূল্যবোধ ও জীবনাচারের প্রকাশ্য সংঘাত অব্যাহত রয়েছে এবং দু'য়েরই স্বাতন্ত্রতা রাজনৈতিক পর্যায়েও লক্ষ্যনীয়। পাকিস্তানের সাথে বৈরীতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হলেও মুসলিম জাতি হিসেবে সম্মানের সাথে বেঁচে ও টিকে থাকা ছাড়া বাংলাদেশের সামনে অন্য কোন বিকল্প নেই। সে কারণেই কলিনস ও ল্যাপায়ার (১৯৭৫) যথাযথভাবেই বলেছেন যে, বাংলাদেশ হচ্ছে জিন্নাহের দ্বি- জাতি তত্ত্বের বাই প্রোডাক্ট। অতএব এটা নিশ্চিতভাবেই যে কেহ বলবে যে পাকিস্তান ও মুসলিম দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মধ্যে বাংলাদেশের উত্তম ভবিষ্যত নিহিত।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অপরিহার্যতা

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে সম্মানের সাথে বাস করার জন্যে উভয় দেশকেই বৃহত্তর ঐক্যের জন্য আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে উদ্যোগ নিতে হবে। এই প্রয়োজনের গুরুত্ব আমাদের পূর্ব পুরুষরা উপলব্ধি করেছিল মুসলিম লীগ সংগঠনের মাধ্যমে- যে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঢাকার মহৎ মানব হিতৈষী নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে। ঐ প্রয়োজন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শেষ হয়ে যায়নি; কিংবা যায়নি ১৯৭১ সালের বিচ্ছিন্ন হবার কারণেও -যা খ্যাতিমান ঐতিহাসিক মরহুম ড: মতিয়ার রহমান (নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া), মরহুম ব্যারিষ্টার আলী আব্বাস (চান্দাইকোনা, পাবনা), মরহুম মাহমুদ আলী (সুনামগঞ্জ) আমৃত্য বলে গেছেন। মরহুম মাহমুদ আলীর সর্বশেষ লেখা 'এক জাতি দুই রাষ্ট্র' বইয়ে

এই সম্পর্কে তার অকাট্য যুক্তি উল্লেখ করে গেছেন। একই ধরণের রীতিমত ভবিষ্যতবাণী করেছেন মহান অধ্যাপক খ্যাতিমান শিক্ষাবীদ- সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক মরহুম ড: সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেইন তার এক বিবৃতিতে। ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে প্রদত্ত উক্ত বিবৃতি পরবর্তীতে তার সর্বশেষ বইয়ে সন্নিবেশিত হয়, যা ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে মুদ্রণখানায় গেলেও বইটি প্রকাশিত হয় তার ইন্তেকালের (১২ জানুয়ারি, ১৯৯৫ইং) এক মাস পর। উক্ত বিবৃতিতে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীনভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে, এমনকি নামমাত্র স্বাধীন একটি দুর্বল বাংলাদেশও ভারতের নিকট একটি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালাতন বা উৎপীড়ণের হেতু রূপেই গণ্য যা তার নিকট সহনীয় হতে পারেনা। উত্তেজনা প্রশমিত হবার পর ভারত তার প্রধান শত্রু পাকিস্তানের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বুঝাপড়া করা পূর্বক কিছু সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় অনেক বেশী স্বাধীনভাবে উদ্যোগী হবে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কে খাপ খাইলে, যদি তা পুরনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নাও হয়, তাহলেও সেটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বড় গ্যারেন্টি হয়ে থাকবে আর পাকিস্তানের টিকে থাকার পক্ষে হবে বড় ধরণের উৎস। যারা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেনা, তাদেরকে ক্ষীনদৃষ্টিসম্পন্ন স্বপ্নবীদ অথবা ৫ম কলামভূক্ত মারাত্মক দেশদ্রোহী বলেই অভিহিত করা যায়।[১২]

তিন অনুচ্ছেদের উপরোক্ত মন্তব্যগুলো তিনি তার ঐতিহাসিক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন। এই মহান ব্যক্তি উনিশ ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন; অথচ একাত্তরের ঘটনা প্রবাহের সময় পঞ্চম বাহিনী ও ভারতের পোষ্য গুন্ডাদের হাতে নৃশংসভাবে নির্যাতিত হোন। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের পতনের পর তাকে নির্মমভাবে দৈহিক নির্যাতন করা হয় এবং দুই বছরের বেশী সময় কারা নির্যাতন এর একটি হচ্ছে একাত্তরে স্মৃতি এবং অন্যাটি হচ্ছে দি ওয়াষ্ট অব টাইমঃ রিফ্লেকশনস অন দি ডিক্লাইন এন্ড ফল অব ইষ্ট পাকিস্তান। তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য সম্পর্কে কোন পর্যবেক্ষণ আমার করার দুঃসাহস নেই; তবে ঐ মন্তব্যের সর্বাংশকে এই জাতির জন্য নিখুঁত ভবিষ্যতবাণী বলে আমি মনে করি।

সৎ বুদ্ধিজীবি ও উল্লেখযোগ্য রাজনীতিবীদদের সবাই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে একমত; যদিও তারা

[১২] সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেইন, দি ওয়েষ্টস অব টাইমঃ রিফ্লেকশানস অন দি ডিক্লাইন এন্ড ফল অব ইষ্ট পাকিস্তান, নতুন সফর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ: ২৮৪

তা কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে বলবেননা। তবে তারা এটা স্পষ্টই অনুধাবন করেন যে উভয়ই ইসলামের সুমহান আদর্শে অভিন্নভাবে আত্মসঞ্জীবিত। অবশ্য অঞ্চল ভেদে এবং জনগণের মধ্যে ভাষা ও জীবনাচারে হয়তো বিভিন্নতা থাকতে পারে; কিন্তু ইসলামী মূল্যবোধ হচ্ছে উভয়ের অভিন্ন জীবনাচারের লাইফ ব্লাড। এই জীবনাচার থেকেই তারা তাদের জীবন ও জীবিকার মৌলিক প্রেরণা লাভ করে। এটা না থাকলে তারা তাদের ইসলামী মূল্যবোধ হারিয়ে বিশাল ভারতীয় সমাজে লীন হয়ে যেতো। এটা সৎ বুদ্ধিজীবি ও সঠিক চিন্তা- চেতনায় উদ্দীপ্ত সবাই স্বীকার করবেন, কিন্তু ভারতের ভয়ে বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে তারা এই সত্যের কথা প্রকাশ্যে বলবেননা। এ থেকে অনুমান করা দুস্কর নয় যে ভারতীয় অধিপত্যের অক্টোপাশ কত নির্মমভাবে বাংলাদেশকে আকঁড়ে ধরে রেখেছে। আর এখানেই নিহিত রয়েছে ভারতের অব্যাহত অধিপত্যবাদী অপতৎপরতা প্রতিহতকরণে অপরিহার্য ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের উভয় সংকট। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয়কে ভারত ভীতির কলংচক্র ভাঙ্গতে হবে; কেননা এর মাধ্যমেই তারা ভবিষ্যত বংশধরদের ভবিষ্যতকে সম্মানীয় করে তুলতে পারে। ভারতের সকল আধিপত্যবাদী অপতৎপরতাকে প্রতিহত করার চ্যালেঞ্জ স্কন্ধে নিয়েই আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পদাপর্ন করেছি।

পরিশিষ্ঠ এক

বাংলাদেশ- ভারত ২৫- সালা চুক্তি

১ নম্বর অনুচ্ছেদ-
উভয় দেশের জনগণ যে উদ্দেশ্যে সম্মিলিত সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গ করেছে, সেই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় ঘোষণা করেছে যে. তাদের দুটি দেশ এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে স্থায়ী শান্তি বজায় থাকবে। প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা এবং অপর পক্ষের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় উপরে বর্ণিত নীতিমালা এবং সমতা ও পারস্পারিক কল্যাণকর নীতিমালার ভিত্তিতে তাদরে মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সুপ্রতিবেশীসূলভ ও সকল ক্ষেত্রের সহযোগিতা আরও জোরদান ও সুদৃঢ় করবে।

২ নম্বর অনুচ্ছেদ-
জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণ ও রাষ্ট্রের সম- অধিকারের নীতিমালায় উজ্জীবিত ও পরিচালিত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় সকল প্রকার উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ এবং বৈষম্যকে নিন্দা করে এবং এ সবের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত নির্মূলের লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে তারা বদ্ধপরিকর।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করে যাবে এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বের সকল অঞ্চলের জনগণের ন্যায়সঙ্গত আশা- আকাঙ্খার প্রতি এবং তাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাবে।

৩ নম্বর অনুচ্ছেদ-
চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় জোট নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের দৃঢ় প্রত্যায়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করছে এবং তারা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং জাতীয় স্বার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেই উপরোক্ত নীতিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৪ নম্বর অনুচ্ছেদ-
চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় সকল পর্যায়ে বৈঠক ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে একে অপরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৫ নম্বর অনুচ্ছেদ-
চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও সার্বিক সহযোগিতা জোরদার ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখবে। এই দুটি দেশ সম- অধিকার, পারস্পারিক কল্যাণ ও সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতির নীতির ভিত্তিতে নিজের মধ্যে বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

৬ নম্বর অনুচ্ছেদ-
চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় বন্যান নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং পানি বিদ্যুৎ শক্তি ও সেচের উন্নয়ন ও বিকাশে যৌথ সমীক্ষা চালাতে এবং যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণেও সম্মত হয়েছে।

৭ নম্বর অনুচ্ছেদ-
চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় আর্ট, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে।

৮ নম্বর অনুচ্ছেদ-
দুদেশের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তিস্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে ঘোষণা করছে যে, সে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক বন্ধনে যোগদান কিংবা অংশগ্রহণ করবে না।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যে কোন ধরণের আগ্রাসন থেকে বিরত থাকবে এবং অপরপক্ষ সামরিক দিক দিয়ে ক্ষতি কিংবা নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি হতে পারে এমন যে কোন ধরণের কার্য্যরে জন্য নিজস্ব ভূখণ্ড ব্যবহার করার অনুমতি দিবে না।

৯ নম্বর অনুচ্ছেদ-
চুক্তি স্বাক্ষকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে যে কোন ধরণের সামরিক সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী কোন তৃতীয় পক্ষকে যে কোন প্রকারের সহায়তা প্রদান থেকে নিবৃত্ত থাকবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুই পক্ষের মধ্যে কোন এক পক্ষ যদি কখনও আক্রান্ত হয় তবে অথবা আক্রমণের হুমকির সম্মুখীন হয়, তাহলে সেই হুমকি নির্মূলের উদ্দেশ্যে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অবিলম্বে পারস্পারিক সলাপরামর্শে মিলিত হবে এবং এইভাবে তাদের দুই দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

১০ নম্বর অনুচ্ছেদ-
চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে ঘোষণা করছে যে, সে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে,এক বা একাধিক রাষ্ট্রেও সাথে এমন কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে না -যা এই চুক্তির সাথে অসংগতিপূর্ণ।

১১ নম্বর অনুচ্ছেদ-
এই চুক্তি পঁচিশ বছর মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হলো এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের পারস্পারিক সম্মতিক্রমে তা নবায়নযোগ্য। স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ থেকে এই চুক্তি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১২ নম্বর অনুচ্ছেদ-
এই চুক্তি কোন অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদসমূহের ব্যাখার ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে তা পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার চেতনায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে নিস্পত্তি করতে হবে।
উনিশশ' বাহাত্তর সালের উনিশে মার্চ তারিখে সম্পাদিত।

ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ভারত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে

শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ- এর পক্ষে

পরিশিষ্ট দুই

১৭৫৭ সালের মীরজাফর ও বৃটিশদের চুক্তি

"আমি আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জীবনকালে আমি এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মানিয়া চলিব।
আরা- ১ : নবাব সিরাজ- উ- দৌলার সঙ্গে শান্তিচুক্তির যেইসব ধারা সম্মতি লাভ করিয়াছিল, আমি সেইসব ধারা মানিয়া চলিতে সম্মত হইলাম।
আরা- ২ : ইংরেজদের দুশমন আমারও দুশমন, তারা ভারতবাসী হোক অথবা ইউরোপীয়।
আরা- ৩ : জাতিসমূহের স্বর্গ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসীদের সকল সম্পত্তি এবং ফ্যাক্টরীগুলি ইংরেজদের দখলে থাকিবে এবং আমি কখনো তাহাদিগকে (ফরাসীদেরকে) এই তিনটি প্রদেশে আর কোন স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করিতে দিব না।
আরা- ৪ : নবাব সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা দখল ও লুণ্ঠনের ফলে ইংরেজ কোম্পানী যেইসব ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহার বিবেচনায় এবং তন্নিমিত্ত মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ আমি তাহাদিগকে এক ক্রোড় তঙ্কা প্রদান করিবো।
আরা- ৫ : কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য আমি তাহাদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ তঙ্কা প্রদান করিতে সম্মত হইলাম।
আরা- ৬ : কলিকাতার জেন্টু (হিন্দু) মূর (মুসলমান) এবং অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদান করা হইবে বিশ লক্ষ তঙ্কা। (ইংরেজরা হিন্দুদেরকে 'জেন্ট' এবং মুসলমানদেরকে 'মূর' ও 'মেহোমেটান' বলে চিহ্নিত করত।)
আরা- ৭ : কলিকাতার আর্মেনীয় অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে সাত লক্ষ তঙ্কা। ইংরেজ, জেন্টু, মূর এবং কলিকাতার অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদেয় তঙ্কার বিতরণ ভার ন্যস্ত রহিল এডমিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইভ, রজার ড্রেক, ইউলিয়াম ওয়াটস, জেমস কিলপ্যাট্রিক এবং রিচার্ড বীচার মহোদয়গণের উপর। তাঁহারা নিজেদের বিবেচনায় যেমন প্রাপ্য তাহা প্রদান করিবেন।

আরা- ৮ : কলিকাতার বর্ডার বেষ্টনকারী মারাঠা ডিচের মধ্যে পড়িয়াছে কতিপয় জমিদারের কিছু জমি; ওই জমি ছাড়াও আমি মারাঠা ডিচের বাইরে ৬০০ গজ জমি ইংরেজ কোম্পানীকে দান করিব।

আরা- ৯ : কল্পি পর্যন্ত কলিকাতার দক্ষিণস্থ সব জমি ইংরেজ কোম্পানীর জমিদারীর অধিনে থাকিবে এবং তাহাতে অবস্থিত যাবতীয় অফিসাদি কোম্পানীর আইনগত অধিকারের থাকিবে।

আরা- ১০ : আমি যখনই কোম্পানীর সাহায্য দাবি করিব, তখনই তাহাদের বাহিনীর যাবতীয় খরচ বহনে বাধ্য থাকিব।

আরা- ১১ : হুগলীর সন্নিকট গঙ্গা নদীর নিকটে আমি কোন নতুন দুর্গ নির্মাণ করিব না।

আরা- ১২ : তিনটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইবা মাত্র আমি উপরি উক্ত সকল তঙ্কা বিশ্বস্তভাবে পরিশোধ করিবে।

পরিশিষ্ট তিন

তাজউদ্দীনের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী সরকার কর্তৃক ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত ৭ দফা গোপন চুক্তি

(১) বাংলাদেশে ভারত তার ইচ্ছামত, তার পছন্দসই লোক দিয়ে পছন্দসই নেতৃত্ব পাঠিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবে, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধা-সামারিক বলে পরিচিত হবে, কিন্তু এদেরকে গুরুত্বের দিক থেকে ও সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ রাখা হবে।

(ধারণা করা হচ্ছে, এই বাহিনীই হচ্ছে রক্ষীবাহিনী। ভারতীয় সৈন্যের পোষাক, ভারতীয় সেনানী মন্ডলীর নেতৃত্ব ও ভারতের অভিরুচি অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণীর লোককে শতকরা ৮০ জন এবং 'বিশেষ বাদ'-এর সমর্থক ২০ জন করে নিয়ে এই বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। অস্ত্র, গাড়ী, পোষাক, সুযোগ- সুবিধার দিক দিয়ে এই বাহিনীটি মূল বাহিনীকে ছাড়িয়ে গেছে। এ বাহিনীটি ব্যবহার করা হইবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ভারত বিরোধী কোন সরকার ঢাকায় ক্ষমতায় বসলেও এ বাহিনী দিয়ে তাকে উৎখাত করা হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারত বিরোধী রাজনীতির সমর্থকদের এই বাহিনী দিয়েই দমন করা হবে। এই বাহিনীর মধ্যে ভারতপ্রেমিক বিশেষ শ্রেণীর লোকের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় কোন দিন এদেরকে ভারতের বিরুদ্ধে লাগানো যাবে না। এদেশের জনগণ কোন দিন বিপ্লবে অবতীর্ণ হলে, রক্ষী বাহিনীর পোষাক গুণে ভারতীয় সৈন্যরা লাখে লাখে রক্ষীবাহিনী সেজে এদেশের অভ্যন্তরে জনগণকে দমন করতে পারবে।)

(২) বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে যে সামরিক সাহায্য নিয়েছে তা পরিশোধ করতে হবে বিভিন্নভাবেঃ (ক) ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশের কাছে থেকে বাংলাদেশ অস্ত্র কিনতে পারবে না। মাঝে মাঝে ঘোষণা করতে হবে ভারত থেকে এত কোটি টাকার অস্ত্র কেনা হলো। এর দাম ভারতই ঠিক করে দেবে। সরবরাহ দেওয়া হবে অর্ধেক অস্ত্র। সরবরাহকৃত অস্ত্রও ভারত ইচ্ছামত নিজ দেশে নিয়ে যেতে পারবে।

(অর্থাৎ একই অস্ত্র বারবার দেখিয়ে ১৯৭১- এর পাওনা এবং ভারতের সম্পূর্ণ যুদ্ধ খরচ আদায় করা হবে। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের জন্য অস্ত্র ছাড়া কোন ভারী অস্ত্র, সাজোয়া গাড়ী বা ট্যাংক বাংলাদেশকে দেওয়া হবে না।)

(৩) বাংলাদেশের বর্হিবাণিজ্য ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ভারতের অনুমতি ছাড়া কোন পণ্য বিদেশে রফতানী করা যাবে না। কোন পণ্য কত দরে বাইরে রফতানী করতে হবে ভারত সেই দর বেঁধে দেবে। এই সব পণ্য ভারত নিজে কিনতে চাইলে বাংলাদেশ আর কারো সাথে সে পণ্য বিক্রির কথা আলোচনা করতে পারবে না। বাংলাদেশের আমদানী তালিকা ভারতের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(বাংলাদেশে বিদেশী পণ্য আমদানীর ব্যাপারে ভারত উদার থাকবে, যে সব পণ্য ভারতকেও আমদানী করতে হয় -সেগুলি আমদানী করানো হবে বাংলাদেশকে দিয়ে। বাংলাদেশ তার বৈদিশিক মুদ্রার তহবিল ভেঙে বিদেশ থেকে যে সব সামগ্রী আমদানী করবে সেগুলি ভারত নিজে আমদানী করবে না। চোরাচালানের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশ থেকে সেই মালগুলি ভারতীয় টাকায় যোগাড় করবে। বাংলাদেশকে দিয়ে বিপুল পরিমাণে দেড় কোটি ব্লেড আমদানী করিয়েছে। এখন ভারত নিঃখরচায় সেই ব্লেড পেয়ে গেছে।)

(৪) বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাগুলি দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(বাংলাদেশ যেন স্বাবলম্বী হতে না পারে ভারত সেভাবে পরিকল্পনাগুলি কেটে ছিড়ে ঠিক করবে। আইয়ুবী আমলে বাংলাদেশে পরিকল্পনার অর্থ ব্যয় হয়েছে উৎপাদনশীল খাতে। ভারতও বাংলাদেশের উন্নয়নকে অনুৎপাদনশীল রেখে দিতে চায়। ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাৎসরিক এক উন্নয়নশীল রেখে দিতে চায়। ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাৎসরিক এক উন্নয়ন কর্মসূচী ও বাজেটে একই অবস্থা দেখা গেছে। আগামী মহাপরিকল্পনা এখন ভারতের কাছে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাতেও অনুৎপাদনশীল খাত প্রাধান্য পাবে।)

(৫) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতি অনুবর্তী রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার চুক্তিগুলি বাংলাদেশ একতরফাভাবে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ভারত এ চুক্তিগুলির কার্যকারিতা অস্বীকার না করলে বৎসর বৎসরান্তে এ চুক্তিমালা বলবৎ থাকবে।

(৭)ডিসেম্বর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তিটিতে বলা হয়েছিল যে, ভারতীয় সৈন্যরা যে কোন সংখ্যায়, যে কোন সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং বাঁধা প্রদানকারী কোন মহলকে নিশ্চিত করে দিতে পারবে। ভারতীয়

বাহিনীর এ ধরণের অভিযানের প্রতি বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছে। ভারত চুক্তিটি নাকচ না করলে বৎসর বৎসরান্তে এ চুক্তি কার্যকারী থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) আর, সি, মজুমদার, হিস্ট্রী অব এনসিয়েন্ট বেঙ্গল সি, ভাদরাজ এন্ড কোঃ, কলকাতা, ১৯৭১

(২) ঐ বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭১

(৩) বি,সি,সেন, হিস্ট্রোরিকাল এসপেক্টস অব বেঙ্গল ইনিসক্রিপশানস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২

(৪) জে, সেন, গুপ্ত, হিস্ট্রী অব ফ্রীডম ম্যুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ ১৯৪৩- ১৯৭৩, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৪

(৫) বি, এম, আব্বাস, এটি, দি গ্যাঞ্জেস ওয়াটার ডিসপ্যুট, বিকাশ পাবলিশিং লিঃ, দিল্লী, ১৯৮১

(৬) বি, চ্যাটার্জী, ইনসাইড বাংলাদেশ টুডে, এস চাঁন্দ এন্ড কোঃ (প্রাইভেট) লিঃ, নিউ দিল্লী, ১৯৭৩

(৭) এ, রায়না, ইনসাইড 'র', বিকাশ পাবলিশিং হাউস (প্রাইভেট) লিঃ, দিল্লী, ১৯৮১

(৮) এস, এস, বিন্দ্রা, ইন্ডিয়া বাংলাদেশ রিলেশান, দিল্লী, ১৯৮২

(৯) বাংলাদেশ সরকার, ব্যুরো অব ষ্টেটেসটিক্স, ষ্টেটেসটিক্যাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ , ১৯৮৪- ৮৫, ঢাকা

(১০) বি, মাধোক, ষ্টরমি ডিকেডঃ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, ১৯৭০- ৮০, দিল্লী, ১৯৮০

(১১) পি, চোপড়া, ইন্ডিয়াজ সেকেন্ড রেভ্যুলেশন, বিকাশ পাবলিশিং হাউস (প্রাইভেট) লিঃ, দিল্লী, ১৯৭৩

(১২) এইচ, ভি, হডসন, দি গ্রেট ডিভাইডঃ বৃটিশ- ইন্ডিয়া- পাকিস্তান, হুচিনশন, লন্ডন, ১৯৬৯

(১৩) এ, এম, আহমেদ এন্ড অব বিট্রায়াল এন্ড রেষ্টোরেশান অব দি লাহোর রেজ্যুলেশন- খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৪

(১৪) এন, সি, চৌধুরী, দাই হ্যান্ড, গ্রেট এনার্কঃ ইন্ডিয়া ১৯২১- ১৯৫২, চাট্টো এন্ড উইনডাস, লন্ডন, ১৯৮৭

(১৫) কে, কে, আজিজ (ই), মুসলিমস আন্ডার দি কংগ্রেস রুল ১৯৩৭- ১৯৩৯, ভল্যুয়ম- ২, ফ্রেন্ডস বুক হাউস, করাচী ১৯৭৯

(১৬) এ, আর, মল্লিক বৃটিশ পলিসি এন্ড মুসলিমস ইন বেঙ্গল ১৭৫৭- ১৮৫৬, এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৬০

(১৭) অমলেন্দু দে, বাঙালি বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, রত্না প্রকাশনী, ১৯৭৪

(১৮) এ, এম, আহমেদ, পাক বাংলার কালচার, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৬৬

(১৯) এস, এস, হোসেইন একাত্তরের স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৯৩

(২০) ঐ দি ওয়াষ্টস অব টাইমঃ রিফ্লেকশান অন দি ডিক্লাইন এন্ড ফল অব ইষ্ট পকিস্তান, মুসলিম রেঁনেসা ম্যুভমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৫

(২১) অলি আহাদ, জাতীয রাজনীতিঃ ১৯৪৩- ১৯৭৫, বর্ণলিপি মুদ্রায়ণ, ঢাকা, ১৯৭৬

(২২) এল, কলিনস এন্ড ডি লা পিয়েরী, ফ্রীডম এট মিডনাইট, কলিনস, লন্ডন, ১৯৭৫

(২৩) প্রমাথন ব্যানার্জী, ইটি এএল (ইডি), হান্ড্রেড ইয়ার্স অব দি ইউনির্ভাসিটি অব কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭

(২৪) এইচ, এম, আব্বাসী, ওভার এ কাপ অব টী, মাশরুর অফসেট প্রেস, করাচী, ১৯৭৪

(২৫) মহিউদ্দীন আলমগীর, বাংলাদেশঃ এ কেস বিলো প্রোভার্টি লেভেল ইকুইলিব্রিয়াম ট্র্যাপ, বিআইডিএস, ঢাকা, ১৯৭৫

(২৬) কে, আহমেদ এন্ড এন, হাসান, রিপোর্ট অব দি নিউট্রিশান সার্ভে ১৯৭৫- ৭৬ এবং ১৯৮১- ৮২, ইনষ্টিটিউট অব ফুড এন্ড নিউট্রিশান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০

(২৭) বাংলাদেশ সরকার, থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এডুকেশান সেক্টর ডক্যুমেন্ট, ঢাকা, ১৯৮৫

(২৮) এম, টি, হোসেন ইন্ডিয়া'জ ফারাক্কা ব্যারেজঃ কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার অব বাংলাদেশ , আল হিলাল, লন্ডন, ১৯৯৬

(২৯) ঐ, প্যাট্রিয়ট- ট্রেইটর কোশ্চেনঃ বাংলাদেশ সিন্ড্রম, নেহা পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬

(৩০) কে, বি, সাঈদ, পাকিস্তান ১৮৫৮- ১৯৪৮, দি ফরমেটিভ ইয়ার্স, অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯৬৮

(৩১) আর, সাইমন্ডস, দি বৃটিশ এন্ড দেয়ার সাকসেসারস, ফেবার এন্ড ফেবার, ১৯৬৬

(৩২) আর, ব্রেনবান্তি, এশিয়ান ব্যুরোক্রেটিক সিস্টেম ইমারর্জেন্ট ফ্রম দি বৃটিশ কলোনিয়াল ট্রাডিশান, ডিউক ইউনির্ভাসিটি ষ্টাডি সেন্টার, ইউএস এ, ১৯৬৮
(৩৩) এইচ, এ রিজভী, দি মিলিটারী এন্ড পলিটিকস্ ইন পাকিস্তান, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, লাহোর, পাকিস্তান, ১৯৭৬
(৩৪) এস, এস, বিন্দ্রে, ইন্ডিয়া পাকিস্তান রিলেশানসঃ তাসখন্দ টু সিমলা এগ্রিমেন্ট, দীপ এন্ড দীপ পাবলিকেশনস, নয়া দিল্লী, ১৯৭৫
(৩৫) অমলেন্দু দে, স্বাধীন বঙ্গভূমি ঘটানোর পরিকল্পনাঃ প্রয়াস ও পরিণতি, রত্না প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫
(৩৬) এ, এস, শর্মা, ফারাক্কাঃ দি গর্ডিয়ান নট, ইশিকা, কলকাতা, ১৯৮৬
(৩৭) এম, রহমান এন্ড এন, হাসান, আয়রণ বারস অব ফ্রীডম, নিউজ এন্ড মিডিয়া লিমিটেড, লন্ডন, ১৯৮০
(৩৮) ভারত সরকার, ন্যাশনাল এটলাস অব ইন্ডিয়া, ভলিয়্যুম- ১, ১৯৮০
(৩৯) এম, রহমান, বাংলাদেশ টুডেঃ এন ইন্ডিক্টমেন্ট এন্ড এ লেমেন্ট, নিউজ এন্ড মিডিয়া লিমিটেড, লন্ডন, ১৯৭৮
(৪০) বি, মাধোক, প্রট্টেট অব এ মার্টায়ারঃ বায়োগ্রাফী অব ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী, যাইকো পাবলিশিং হাউস, বোম্বে
(৪১) ঐ, ইন্ডিয়ানাইজেশান, এস, চাঁন্দ এন্ড কোঃ (প্রাইভেট) লিঃ, দিল্লী, ১৯৭০
(৪২) জোবায়দা ইয়াজদানী উইথ এম, ক্রীষ্টাল, দি সেভেনথ নিজামঃ দি ফলেন এম পায়ার, ক্যামব্রীজ ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯৮৫
(৪৩) এস, এস, পীরজাদা, দি ফাউন্ডেশানস অব পাকিস্তানঃ মুসলিম লীগ ডক্যুমেন্টস ভল্যুয়ম- ২: ১৯২৪- ৪৭, ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিঃ, করাচী এন্ড ঢাকা, ১৯৭০
(৪৪) জয়া চ্যাটার্জী, বাংলা ভাগ হলো, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৭
(৪৫) এস, এস, ইকরামউল্ল্যাহ, হোসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীঃ এ বায়োগ্রাফী, ওইউপিএল, করাচী, ১৯৯১
(৪৬) এম, আই, চৌধুরী, আমার স্মৃতি, ঢাকা, ২০০৬
(৪৭) পি, এ, নজীর, স্মৃতির পাতা থেকে, মুসলিম রেঁনেসা ম্যুভমেন্ট, ঢাকা, ২০০৭
(৪৮) জে, পি, নায়েক এন্ড এস নুরুল্লাহ, এ ষ্টুডেন্টস' হিস্ট্রী অব এডুকেশান ইন ইন্ডিয়া ১৮০০- ১৯৭৩, ম্যাকমিলান, নয়া দিল্লী, ১৯৯৬

(৪৯) এস, এস, আন্দালীব, পলিটিক্যাল কালচার ইন বাংলাদেশ, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৭
(৫০) এ, এ, কে, নিয়াজী, দি বিট্রায়াল অব ইষ্ট পাকিস্তান, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৬
(৫১) সিদ্দিক সালিক, উইটনেস টু সারেন্ডার, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৭
(৫২) এস, এম, চৌধুরী, দি আলটিমেট- ক্রাইমঃ আই উইটনেস টু পাওয়ার গেমস, কওমী পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯৯
(৫৩) হাসান জহীর, দি সেপারেশান অব ইষ্ট পাকিস্তান, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০১
(৫৪) ষ্ট্যানলী ওলপার্ট, জুলফী ভুট্রো অব পাকিস্তানঃ হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ওউউপি, দিল্লী, ১৯৯৩
(৫৫) এম, এ, মু'মিন চৌধুরী, বিহাইন্ড দি মিথ অব থাট্রি মিলিয়ন, আল-হিলাল, লন্ডন, ১৯৯৬
(৫৬) ঐ, দি রাইজ এন্ড ফল অব বুদ্ধিইজম ইন সাউথ এশিয়া, লিসা, লন্ডন, ২০০৮
(৫৭) নিরোদ সি চৌধুরী, আত্মঘাতী বাঙালী ভল্যুয়ম- ১ ও ২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৮
(৫৮) মাহমুদ আলী, কায়েদ- ই- আযম এন্ড মুসলিম ইকনমিক রিসার্জেন্স, দি কনসেপ্ট পাবলিকেশানস ট্র্যাষ্ট, ইসলামাবাদ, ১৯৭৭/২০০২

সাময়িকী, পুস্তিকা ইত্যাদি

১। ইমপেক্ট ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, সেপ্টেম্বর ২৮- অক্টোবর ৮, ১৯৮৭, জানুয়ারী ৮- ২১, ১৯৮৮ ইত্যাদি
২। দি কনসেপ্ট, ইসলামাবাদ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ ইত্যাদি
৩। পূর্ণিমা (সাপ্তাহিক) ঢাকা, ২০ এপ্রিল, ১৯৮৮
৪। দি টাইমস, লন্ডন, ১৮ মার্চ, ১৯৮৮
৫। বাংলাদেশ সরকার, ব্যুরো অব ষ্টেটিসটিকস, ইকনামিক ইন্ডিকেটারস অব বাংলাদেশ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫
৬। ইন্ডিয়া টুডে (সাপ্তাহিক), ৩১ মার্চ, ১৯৮৭
৭। দি সানডে অবজার্ভার, লন্ডন, ২৭ মার্চ, ১৯৮৮

৮। দি জুইশ ক্রনিক্যাল, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৮৮
৯। দি টাইমস (ডেইলী) লন্ডন, ২৭ এপ্রিল
১০। আমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট অন দি এন্টি মুসলিম রায়টস ইন ইন্ডিয়া, ২০ নভেম্বর, ১৯৮৭
১১। আল- হিলাল, লন্ডন, ১৯৮৬ এন্ড ১৯৮৭ ইস্যু সমূহ
১২। এম, টি, হোসেন, ভারতীয় আগ্রাসনের একটি দিক, ঢাকা, ১৯৮৬
১৩। ঐ, এক্সটেন্ট, ম্যাগানিটিউট এন্ড ডাইমেনশানস অব পোভার্টি ইন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৫
১৪। আব্দুল মালেক, ফ্রম ইষ্ট পাকিস্তান টু বাংলাদেশ, লন্ডন, ১৯৭৩
১৫। এন, হাসান, বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবের বাংলাদেশ, লন্ডন, ১৯৭৫
১৬। এম, এম, ইসলাম, দি ফরগটেন থাউজেন্ডস, লন্ডন, ১৯৭৩
১৭। এম, আসাদ, হোয়েন ম্যান ষ্টপড্ টু বিকাম বীষ্ট, ইলফোর্ড, এসেক্স, ১৯৭৪
১৮। দি টেল দ্যাট ওয়াজ নেভার টোল্ড, ইউনাইটেড ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ, বৈরুত, লেবানন (এনডি)

-সমাপ্ত-